POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُکُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَہۡلِہَا ۙ وَ اِذَا حَکَمۡتُمۡ
بَیۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡکُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ نِعِمَّا یَعِظُکُمۡ بِہٖ ؕ
اِنَّ اللّٰہَ کَانَ سَمِیۡعًۢا بَصِیۡرًا (سورۃالنساء:۵۹)

অনুবাদ:নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে তোমরা আমানতসমূহ উহাদের প্রাপককে অর্পন কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচর কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সাহিত বিচার কর; আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় উহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

[সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯]

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

খণ্ড 11

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 33

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বাৎসরিক চাঁদা ৬০০ টাকা

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 13 Aug 2026 29 সফর 1448 A.H

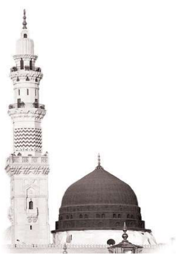

মহানবী (সা.)- এর বাণী

যখন অযোগ্য লোকদের শাসক ও কর্তৃত্বের পদে নিয়োগ করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো

عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنۡهُ قَالَ: قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ضُيِّعَتِ الۡأَمَانَةُ فَانۡتَظِرِ السَّاعَةَ". قَالَ: كَيۡفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوۡلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: "إِذَا أُسۡنِدَ الۡأَمۡرُ إِلَى غَيۡرِ أَهۡلِهِ فَانۡتَظِرِ السَّاعَةَ".

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন আমানত নষ্ট হতে শুরু করবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।” এক ব্যক্তি আরজ করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমানত নষ্ট হওয়ার অর্থ কী?তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “যখন অযোগ্য লোকদের শাসক ও কর্তৃত্বের পদে নিয়োগ করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।” [সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব: রফ' উল-আমানাহ, হাদিস নং ৬৪৯৬]

عَنۡ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ الۡخَازِنَ الۡمُسۡلِمَ الۡأَمِينَ الَّذِي يُنۡفِذُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُعۡطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعۡطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفۡسُهُ، فَيَدۡفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الۡمُتَصَدِّقَيۡنِ".

হযরত আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে মুসলমানকে মুসলমানদের সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়, যদি সে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হয়, তাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয় তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে এবং যাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাকে আন্তরিক আনন্দ ও সন্তুষ্টির সঙ্গে, তার প্রাপ্য অধিকার হিসেবে তা প্রদান করে, তবে সেই ব্যক্তিও কার্যত এমন সওয়াব লাভ করবে, যেমন দানকারী ব্যক্তি সদকা করার সওয়াব লাভ করে।” [সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাব: আজরুল খাযিনিল আমীন ওয়াল-মারআহ]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তাকওয়া হলো এই যে, মানুষ যথাসাধ্য আল্লাহর সমস্ত আমানত, ঈমান-সংক্রান্ত অঙ্গীকার এবং একইভাবে সৃষ্টির সমস্ত আমানত ও অঙ্গীকার যথাযথভাবে রক্ষা করবে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

“আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাকওয়াকে পোশাকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন কুরআন শরীফে এসেছে: لِبَاسُ التَّقۡوٰی। এর দ্বারা এ কথারই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আত্মিক সৌন্দর্য এবং আত্মিক অলংকার কেবল তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

আর তাকওয়া হলো এই যে, মানুষ যথাসাধ্য আল্লাহর সমস্ত আমানত, ঈমান-সংক্রান্ত অঙ্গীকার এবং একইভাবে সৃষ্টির সমস্ত আমানত ও অঙ্গীকার যথাযথভাবে রক্ষা করবে; অর্থাৎ সেগুলোর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিক পর্যন্ত যথাসম্ভব পালন করবে।

আমানত বলতে পরিপূর্ণ মানুষের সেই সমস্ত শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, হৃদয়, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ, ভয়, ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা এবং সকল আত্মিক ও দৈহিক নিয়ামতকে বোঝায়, যা আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেন। অতঃপর সেই পরিপূর্ণ মানুষ, এই আয়াতের নির্দেশ অনুসারে- اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُکُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَہۡلِہَا-এই সমস্ত আমানত আল্লাহরই নিকট ফিরিয়ে দেয়; অর্থাৎ নিজ সত্তাকে আল্লাহর মধ্যে বিলীন করে তাঁর পথে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দেয়...

আর এই মহান, সর্বোচ্চ, সর্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণতম গুণ আমাদের নেতা, আমাদের প্রভু, আমাদের পথপ্রদর্শক, উম্মী নবী, সত্যবাদী ও সত্যপ্রাপ্ত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল।”

(আইনা-এ কামালাতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬২)

তফসীরে কবীর

যখন এই আমানত তোমাদের হাতে অর্পিত হবে, তখন কখনোই তাতে খিয়ানত করবে না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা আল-মু'মিনূনের وَالَّذِیۡنَ ہُمۡ لِاَمٰنٰتِہِمۡ وَعَہۡدِہِمۡ رٰعُوۡنَ আয়াতের তাফসিরে বলেন:

“সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কী চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন! হিমস, যা ছিল খ্রিষ্টানদের একটি প্রধান নগর, মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং তারা খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে কর হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করেন। কিন্তু পরে যখন যুদ্ধসংক্রান্ত প্রয়োজনের কারণে তাদের শহরটি খালি করতে হলো, তখন তারা শহরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ডেকে পাঠালেন, তাদের সমস্ত অর্থ ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, ‘আমরা তোমাদের কাছ থেকে এই কর নিয়েছিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা তোমাদের জান-মাল রক্ষা করব। কিন্তু এখন যেহেতু পরিস্থিতি সংকটপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং আমরা এই শহর ছেড়ে যাচ্ছি, তাই তোমাদের অর্থ নিজেদের কাছে রেখে দেওয়া সততা ও আমানতদারির নীতির পরিপন্থী বলে আমরা মনে করি।' অতঃপর তারা লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের ফিরিয়ে দিলেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই ঘটনা খ্রিষ্টানদের হৃদয়ে এত গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে, মুসলিম বাহিনী যখন শহর ত্যাগ করছিল, তখন তারা তাদের সঙ্গে বিদায় জানাতে বেরিয়ে পড়েছিল। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল এবং তারা বলতে বলতে চলছিল, ‘আল্লাহ যেন তোমাদের আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনেন। কারণ তোমাদের মতো ন্যায়পরায়ণ শাসক আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি।' (ফুতুহুল বুলদান, আল-বালাযুরী, ‘আমর হিমস ও ইয়াওমুল ইয়ারমুক')

অনুরূপভাবে, ইসলাম রাষ্ট্রীয় শাসনকেও একটি আমানত হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং নির্দেশ দিয়েছে যে, যখন এই আমানত তোমাদের হাতে অর্পিত হবে, তখন কখনোই তাতে খিয়ানত করবে না। বরং সর্বদা রাষ্ট্রক্ষমতার দায়িত্ব এমন ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করবে, যারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পূর্ণ সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানরা এই নির্দেশের ওপর অত্যন্ত কঠোরভাবে আমল করেছেন।”

(তাফসিরে কবীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৭৮, ইউকে সংস্করণ)

আহমদীয়া সংবাদ

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রিয় নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থ ও কুশল আছেন।

সকল আহমদী ভাই-বোন যেন হুজুরে আনওয়ার (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর সুস্বাস্থ্য, কর্মময় দীর্ঘায়ু, মহান লক্ষ্যসমূহে সফলতা এবং বিশেষ নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত দোয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা যেন প্রতিটি মুহূর্তে হুজুরের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী হন এবং তাঁকে সর্বদা নিজের সমর্থন ও বিজয় দান করেন। আমীন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সম্পাদকীয়

আহলে কুরআন ও আহলে হাদিসের মতপার্থক্য এবং হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাকাম ও আদল হিসেবে ঈমান-উদ্দীপক ফয়সালা

আহলে কুরআন ও আহলে হাদিসের মতপার্থক্য এবং হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাকাম ও আদল হিসেবে ঈমান-উদ্দীপক ফয়সালা

সৌদি আরব সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে এ ধরনের খবর প্রচারিত হচ্ছিল যে, সৌদি আরব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে "মুতাওয়াতির" হাদিস ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত হাদিসের ওপর আমলকে সন্দেহজনক মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কিছু মুসলিম মোল্লা অথবা তাদের অনুসারীরা, যারা দিনরাত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণের আবেগ উসকে দেওয়া এবং সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য এ ধরনের সংবাদ ছড়িয়ে বেড়ান, এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

বাস্তবতা হলো, কয়েক বছর আগে সৌদি সরকার তাদের দেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে উন্নত করার জন্য "ভিশন ২০৩০" নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল-তেলের আয়ের বাইরে আর কোন কোন উপায়ে সৌদি আরবকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যায়। এর মধ্যে ছিল পর্যটন, প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আধুনিক নগর নির্মাণ, বিনোদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নারীদের কর্মসংস্থান ও তাদের স্বাধীনতার দিকে পদক্ষেপ ইত্যাদি। এর পাশাপাশি কিছু ধর্মীয় সংস্কারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআনের পাশাপাশি মুতাওয়াতির হাদিসকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা এবং আহাদ ও খবর ধরনের হাদিসকে নিম্নস্তরে রাখা।

এ বিষয়ে সৌদি সরকারের বক্তব্য কী ছিল এবং বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে কিছু মোল্লা কী বলছেন-এসব আলোচনা বাদ দিয়ে আমরা এই যুগের প্রেরিত ব্যক্তি, সাইয়্যেদনা হযরত আকদাস মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কুরআন মাজীদ, সুন্নাহ ও হাদিস থেকে হিদায়াত গ্রহণের বিষয়ে কী দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা তুলে ধরছি। আমরা এও নিবেদন করি যে, উম্মত যেখানে যেখানে হোঁচট খেয়েছে এবং যেখানে যেখানে দিকনির্দেশনার প্রয়োজন অনুভব করেছে, সেখানে সেখানে তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই আহলে কুরআন নামে একটি দল গঠিত হয়েছিল। সে সময় এ দলের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ চাকড়ালভী সাহেব এবং গুলাম আহমদ পারভেজী সাহেব। তাঁদের সঙ্গে আহলে হাদিস আলেমদের প্রায়ই বিতর্ক হতো। এর মধ্যে ১৯০২ সালে আবদুল্লাহ চাকড়ালভী সাহেব এবং মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেবের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

আবদুল্লাহ সাহেব ছিলেন আহলে কুরআনের অনুসারী এবং মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেব ছিলেন আহলে হাদিসের অনুসারী। আবদুল্লাহ চাকড়ালভী সাহেব ও তাঁর অনুসারীরা শুধু কুরআন মাজীদকেই গ্রহণ করতেন এবং হাদিসকে আমলযোগ্য মনে করতেন না। অন্যদিকে মাওলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে, হাদিস আল্লাহর কিতাব কুরআনের ওপর বিচারকের মর্যাদা রাখে। উভয় পক্ষই চরমপন্থার মধ্যে চলে গিয়েছিলেন।

এই বিতর্কের ওপর হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) একটি পর্যালোচনা লিখেছিলেন, যা রূহানী খাযায়েনের ১৯তম খণ্ডে "রিভিউ বার মুবাহাসা বাটালভী ও চাকড়ালভী" শিরোনামে সংকলিত রয়েছে। সেখানে তিনি কুরআন মাজীদ ও হাদিসের মহান শিক্ষার আলোকে উভয় পক্ষকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। মুসলিম আলেম ও তাঁদের সরকারগুলোর জন্যও এই দিকনির্দেশনা অনুসরণযোগ্য।

তিনি বলেন- "তিনটি বিষয় রয়েছে, যা আল্লাহ তোমাদের হিদায়াতের জন্য দিয়েছেন। প্রথম হলো কুরআন। দ্বিতীয় হিদায়াতের মাধ্যম হলো সুন্নাহ, অর্থাৎ সেই পবিত্র আদর্শ, যা মহানবী (সা.) নিজের কাজ ও আমলের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন। যেমন তিনি নামাজ পড়ে দেখিয়েছেন যে, এভাবে নামাজ পড়তে হয়; রোজা রেখে দেখিয়েছেন যে, এভাবে রোজা রাখতে হয়। এর নাম সুন্নাহ, অর্থাৎ নববী আদর্শ, যা আল্লাহর বাণীকে বাস্তব কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। তৃতীয় হিদায়াতের মাধ্যম হলো হাদিস, যা মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর বাণীসমূহ সংকলিত হয়েছে। হাদিসের মর্যাদা কুরআন ও সুন্নাহর তুলনায় নিম্নতর, কারণ অধিকাংশ হাদিস সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে বর্ণিত। তবে যদি তার সঙ্গে সুন্নাহর সমর্থন থাকে, তাহলে তা নিশ্চিত মর্যাদা লাভ করে।"

(কিশতী নূহ, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪, নাযারতে নশর ও ইশাআত, কাদিয়ান, ২০১৮)

এই দিকনির্দেশনার প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) উল্লিখিত দুই আলেমের বিতর্কের পর্যালোচনায় বলেন-

"প্রকৃত বিষয় হলো, এই দুই দলের মধ্যে একটি দল বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করেছে এবং অন্যটি অবহেলার পথ গ্রহণ করেছে। প্রথম দল অর্থাৎ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব এ বিষয়ে সত্যের ওপর আছেন যে, মারফূ, মুত্তাসিল নববী হাদিসগুলোকে অগ্রাহ্য বা অর্থহীন মনে করা উচিত নয়। কিন্তু তিনি মর্যাদার ক্রম রক্ষা না করে হাদিসকে এমন উচ্চ স্থানে উন্নীত করেন, যাতে কুরআন শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং কার্যত কুরআনকে অস্বীকার করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এটি সুস্পষ্ট ভুল এবং ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুতি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন-

আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের পর আর কোন হাদিসে তারা ঈমান আনবে?

অন্যদিকে তাঁদের প্রতিপক্ষ মাওলভী আবদুল্লাহ সাহেব অবহেলার পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে হাদিস অস্বীকার করেছেন। অথচ হাদিস অস্বীকার করা এক অর্থে কুরআনকেও অস্বীকার করা। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন- قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

অর্থাৎ, বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।

যেহেতু আল্লাহর ভালোবাসা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁর বাস্তব আদর্শ জানার জন্য, যার ওপর অনুসরণ নির্ভরশীল, হাদিসও একটি মাধ্যম, সেহেতু যে ব্যক্তি হাদিসকে পরিত্যাগ করে, সে প্রকৃতপক্ষে অনুসরণের পথও পরিত্যাগ করে।"

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) অন্যান্য মুহাদ্দিস ও তাঁদের সমালোচকদের পদ্ধতি থেকে ভিন্নভাবে হাদিস যাচাইয়ের একটি নীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে হাদিস কুরআন মাজীদের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা যতই দুর্বল (যঈফ) হোক না কেন, তা গ্রহণ করা উচিত। আর যদি কোনো হাদিস যতই নির্ভরযোগ্য বা মুতাওয়াতির হোক, কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষার বিরুদ্ধে হয়, তাহলে প্রথমে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। যদি কোনোভাবেই সেই বৈপরীত্য দূর করা না যায়, তবে এমন হাদিস পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য হতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, যদি কোনো হাদিসে এমন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী থাকে, যা মুহাদ্দিসদের মতে দুর্বল বলে বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হয়, তবে সেই হাদিসকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে এবং যেসব মুহাদ্দিস বা বর্ণনাকারী একে দুর্বল বা জাল বলেছেন, তাঁদের ভুল হয়েছে বলে মনে করতে হবে। এ ধরনের শত শত হাদিস রয়েছে, যাতে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলোর অধিকাংশকেই মুহাদ্দিসরা দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ বা জাল বলেছেন। অতএব, যদি এ ধরনের কোনো হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়, আর তোমরা শুধু এ অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান কর যে এটি দুর্বল হাদিস বা এর কোনো বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নন, তবে তা তোমাদের নিজের ঈমানের দুর্বলতার পরিচয় হবে। কারণ আল্লাহ নিজেই যার সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন, তাকে অস্বীকার করা মোমিনসুলভ আচরণ নয়।

(কিশতীয়ে নূহ-এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ)

অতএব, হাদিস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এগুলোই সেই সুদৃঢ় নীতিমালা, যা সাইয়্যেদনা হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন। যিনি এই যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে হাকাম ও আদল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর উপস্থাপিত সকল ঐশী সিদ্ধান্ত মেনে চলার মাধ্যমেই ইসলামের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হতে পারে। তাই হাদিস যাচাই এবং তার ওপর আমল করার ক্ষেত্রে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর উল্লিখিত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধুয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)- এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্রোধকে উত্তেজিত করবে।

(রাযে হাকীকাত, পৃঃ ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার আদর্শ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১৯ জুন , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১৯ এহসান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতা প্রসঙ্গে কিছু রেওয়ায়েত উপস্থাপন করব।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একদা আনসারদের মধ্য থেকে কিছু লোক মহানবী (সা.)-এর কাছে (কিছু) চাইলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে দিলেন। তারা আবারও তাঁর কাছে কিছু চাইলেন, আর তিনি (সা.) তাদেরকে দিলেন। এরপর তারা আবারও তাঁর কাছে কিছু চাইলেন, আর তিনি (সা.) তাদেরকে দিলেন, এমনকি তাঁর কাছে যা ছিল তা সব শেষ হয়ে গেল। তিনি (সা.) বললেন, আমার কাছে যে সম্পদই থাকুক না কেন, আমি তা তোমাদের থেকে কখনোই লুকিয়ে রাখব না। আর যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তা'লাও তাকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ, একইসাথে চাওয়ার বিষয়ে নসীহতও করলেন, আর যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের প্রতি অমুখাপেক্ষী হতে চাইবে, আল্লাহ তা'লাও তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির ওপর জোর দিয়ে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ তা'লাও তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক প্রশস্ত ও উত্তম কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।" [সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৪৬৯]

কখনো কখনো বিভিন্ন সমস্যায়, কষ্টে ও প্রয়োজনে ধৈর্যধারণ করাও আবশ্যক হয়। আল্লাহ তা'লা এর পুরস্কার প্রদান করেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম এবং আমি একটি অবাধ্য ও শক্তিশালী তরুণ উটের পিঠে আরোহণ করেছিলাম যা আমার পিতা হযরত উমর (রা.)-এর ছিল। আর সেটি আমাকে অসহায় করে তুলছিল এবং অন্যান্য লোকদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হযরত উমর (রা.) সেটিকে ধমক দিচ্ছিলেন, অর্থাৎ উটটির সাথে কঠোরতা করছিলেন, তাকে থামাচ্ছিলেন, ডাকছিলেন এবং পেছনে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। হয়তো মারছিলেন বা কোনোভাবে ভয় দেখাচ্ছিলেন।

যাইহোক, উট চালনার যে পদ্ধতিই রয়েছে, সে অনুযায়ী তিনি সেটিকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং উটটি পেছনে সরে যাচ্ছিল । এরপর সেটি আবার লোকদের বাহনের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং হযরত উমর (রা.) তাকে ধমক দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছিলেন, এই সম্মানের খাতিরে যে, মহানবী (সা.)-এর আগে যেন কোনো বাহন বা আরোহী এগিয়ে না যায়। হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষে এটি সহ্য করা সম্ভব ছিল না যে, কোনো বাহন মহানবী (সা.)-এর বাহনকে অতিক্রম করে যাক। এটি দেখে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বললেন, এই উটটি আমার কাছে মূল্য গ্রহণপূর্বক বিক্রি করে দাও।" তিনি (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসুল (সা.)! এটি তো আপনারই।"

মহানবী (সা.) বললেন, এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।" সুতরাং তিনি তা মহানবী (সা.)-এর কাছে বিক্রি করে দিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) বললেন, আব্দুল্লাহ বিন উমর! এই উটটি এখন তোমার, এটি দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো।" [সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুইয়ূ, হাদীস-২১১৫]

উপহার দেওয়ারও এক অদ্ভুত পদ্ধতি এটি! তিনি (সা.) তাদের সামনে এটিও প্রমাণ করলেন এবং তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন যে, উট তো একটি প্রাণী, সেটি যদি এভাবে এগিয়েও যায়, তবে কোনো দোষ নেই। এখন এই উটটি তো আমার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তাই এটি যদি অন্যান্য বাহনের চেয়ে এগিয়েও যায়, তবে এটাই বলা হবে যে, মহানবী (সা.)-এর উপহার দেওয়া উটটি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেছে।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে একটি যুদ্ধে ছিলাম। আমার উট চলার ক্ষেত্রে ধীর হয়ে গিয়েছিল এবং সেটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যখন সেটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন মহানবী (সা.) আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবের! আমি বললাম, জী হ্যাঁ।" তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী অবস্থা?" আমি বললাম, উট চলার ক্ষেত্রে ধীর হয়ে গেছে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই আমি পেছনে পড়ে গেছি।"তখন তিনি (সা.) বাহন থেকে নেমে সেটিকে অর্থাৎ উটটিকে তার দড়ি ধরে টানতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, আরোহণ করো।" তখন আমি আরোহণ করলাম। আমি দেখলাম, সেটি এতটাই দ্রুতগামী হয়ে গেল যে, মহানবী (সা.)-এর চেয়েও এগিয়ে যেতে লাগল, যার কারণে আমাকে সেটিকে টেনে ধরতে হলো। এরপর মহানবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ?" আমি বললাম, জী হ্যাঁ।" এরপর তিনি (সা.) বললেন, দেখো, তুমি তোমার বাড়িতে পৌঁছানোর কাছাকাছি রয়েছ, যখন পৌঁছবে, তখন বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সাথে কাজ করবে। পরিবারে উত্তম আচরণ হওয়া উচিত।" তারপর তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি তোমার এই উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে?" আমি বললাম, জী হ্যাঁ।" তখন তিনি (সা.) আমার কাছ থেকে সেটি এক উকিয়া রুপার বিনিময়ে কিনে নিলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) আমার আগে মদীনায় পৌঁছলেন এবং আমি পরের দিন সকালে পৌঁছলাম। আমরা মসজিদে এলাম এবং আমি তাঁকে (সা.) মসজিদের দরজায় পেলাম। তিনি (সা.) বললেন, এখন পৌঁছলে?" আমি বললাম, জী হ্যাঁ।" তিনি (সা.) বললেন, তোমার উট ছেড়ে দাও এবং মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ো ।" সুতরাং আমি ভেতরে গেলাম এবং নামায পড়লাম। তিনি (সা.) হযরত বেলাল (রা.) -কে বললেন, তাকে এক উকিয়া রুপা মেপে দাও।" হযরত বেলাল (রা.) আমাকে তা মেপে দিলেন এবং মাপার সময় পাল্লা ঝুঁকিয়ে দিলেন, অর্থাৎ এর চেয়ে একটু বেশিই দিলেন। তারপর আমি পিঠ ঘুরিয়ে চলে গেলাম। তিনি (সা .) বললেন, জাবেরকে আমার কাছে আসার জন্য ডাকো।" আমি মনে মনে বললাম, এখন তিনি (সা.) আমার উটটি আমাকে ফেরত দেবেন, আর এই ফেরত দেওয়ার চেয়ে অপ্রীতিকর আর কোনো কিছু আমার কাছে ছিল না যে, তিনি (সা.) কিনেছেন আর তা আমাকে ফেরত দেবেন। তিনি (সা.) বললেন, তোমার উট নিয়ে নাও, আর এর মূল্যও তোমারই ।"

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুইয়ূ, হাদীস-২০৯৭]

অন্য একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, এরপরে আমি এক ইহুদির পাশ দিয়ে গেলাম এবং যখন আমি তাকে এই পুরো ঘটনাটি বললাম, তখন সে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে থাকে, তিনি কি মূল্যও ফেরত দিয়েছেন এবং উটটিও তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন?" আমি বললাম, হ্যাঁ, এমনটিই হয়েছে।" তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে দেওয়া এই উপহারে এতটাই বরকত হয়েছিল যে, উটটি মহানবী (সা.)-এর যুগ এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগ পেরিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিল।

[নাজাহুল ক্বারী শারাহ বুখারী, খণ্ড-১৬,পৃ: ২২]

তাঁর (সা.) আদর্শ, তাঁর (সা.) তরবিয়ত এবং তাঁর (সা.) পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবই সকল সাহাবীর ওপর পড়েছিল। হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওপরও এই প্রভাব ছিল এবং এই কারণেই তিনি অভাবের কোনো রকম ভয় ছাড়াই নিজের সম্পদ তাঁর (সা.) নিকট সমর্পণ করেছিলেন। অতএব বর্ণনা করা হয় যে, মহানবী (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর কাছে আসলেন এবং তিনি (সা.) কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?" তিনি (সা.) বললেন, এটি দুর্ভিক্ষের সময়। তোমার ব্যাপারে আমার সংকোচ হচ্ছে যে, আমি যদি সম্পদ খরচ করি, তবে তোমার সম্পদ শেষ হয়ে যাবে; আর আমি যদি তা খরচ না করি, তবে আমি আল্লাহকে ভয় করি।" হযরত খাদীজা (রা.) কুরাইশদের ডাকলেন এবং তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) -ও ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত খাদীজা (রা.) দীনার বের করলেন এবং সেগুলো স্তূপ করে রাখলেন, এমনকি সম্পদের আধিক্যের কারণে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না যে, আমার সামনে কে বসে আছে। এরপর হযরত খাদীজা (রা.) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, এই সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.) -এর। তিনি (সা.) চাইলে তা খরচ করতে পারেন, আর চাইলে তা নিজের কাছে রাখতে পারেন।" তিনি (রা.) তাঁর (সা.) দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য এটি দিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঠিক আছে, আপনি তা খরচ করুন।

[তফসীরে কবীর, ইমাম রাজি, খণ্ড-১৬, অংশ: ৩১-৩২, পৃ: ১৯৮]হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কর্তৃক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলো এবং তাঁর (সা.) কাছে কিছু চাইল।

মহানবী (সা.) বললেন, "এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছু নেই, তুমি আমার নামে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নাও। যখন আমার কাছে কিছু আসবে, তখন আমি তা পরিশোধ করে দেব।"

এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনি তো তাকে আগেই দিয়েছেন, আর যা আপনার সাধ্যাতীত, সেটির জন্য আল্লাহ তা'লা আপনাকে দায়ী করেননি।" মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর কথাটি অপছন্দ করলেন, তখন আনসারের মধ্য থেকে একজন বলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি খরচ করুন আর আরশের অধিপতির পক্ষ থেকে অভাবের ভয় করবেন না।' আনসারীর একথায় মহানবী (সা.) মুচকি হাসেন এবং তাঁর (সা.) চেহারায় খুশির ঝিলিক আভা দেখা যায়। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, "আমাকে এই নির্দেশ-ই দেওয়া হয়েছে।"

[শামায়েলুন নবী (সা.), পৃ: ১৪৮-১৪৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন, আহলে সুফ্ফা বা সুফ্ফাবাসীরা মুসলমানদের অতিথি হতেন। তাদের (এমন) কোনো বাড়িঘর ছিল না, যেখানে গিয়ে তারা বিশ্রাম নিতে পারেন, আর এমন কেউ ছিল না যার কাছে গিয়ে তারা থাকতে পারেন। যখন তাঁর (সা.) কাছে কোনো সদকা আসত, তখন তিনি (সা.) তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, কিন্তু নিজে তা থেকে কিছুই নিতেন না। [এমনিতেও তিনি (সা.) সদকা নিতেন না, কারণ তা তাঁর জন্য হারাম ছিল; সেই সদকা অন্যান্য দরিদ্রদের জন্য ছিল।] আর যখন তাঁর (সা.) কাছে কোনো হাদিয়া বা উপহার আসত, তখন তিনি (সা.) আহলে সুফ্ফাকে ডেকে পাঠাতেন এবং তা থেকে নিজেও কিছু নিতেন [অর্থাৎ উপহার এলে], তা থেকে তাদেরকেও দিতেন।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাদীস-৬৪৫২]

দানশীলতা ও বদান্যতার পাশাপাশি সহানুভূতি এবং তরবীয়তেরও কীরূপ উন্নত মান ছিল তাঁর (সা.) মাঝে!

এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক বেদু ঈন এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে সাহায্য প্রার্থনা করে। বর্ণনাকারী হলেন ইকরামা, তিনি বলেন, আমার ধারণা সে 'দিয়াত' বা রক্তপণ প্রদানের ব্যাপারে সাহায্য চাইতে এসেছিল। মহানবী (সা.) তাকে কিছু দান করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, "আমি কি তোমার সাথে সদাচরণ করেছি?' এর উত্তরে সেই বেদু ঈন বলে, 'না। আপনি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেননি।' তখন কিছু মুসলমান রাগান্বিত হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার বা তাকে ধরার মনস্থ করে। তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে ইশারায় প্রতিহত করেন। এরপর মহানবী (সা.) উঠে (নিজের) ঘরে যান এবং সেই বেদু ঈনকেও ঘরে ডাকেন। তিনি (সা.) তাকে বলেন, "তুমি আমাদের কাছে এসেছ এবং আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছ, আর আমরা তোমাকে দিয়েছি, তারপর তুমি এমন কথা বলেছ, যা তুমি বলেছ। তুমি জানো যে তুমি কী বলেছ, আমি সুবিচার করিনি!" এরপর মহানবী (সা.) তাকে ঘর থেকে আরও কিছু দান করেন। তারপর তিনি (সা.) বলেন, "এখন কি আমি তোমার সাথে সদাচরণ করেছি?" বেদুইন বলে, 'জী হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'লা আপনার পরিবার ও গোত্রের লোকদের উত্তম প্রতিদান দিন।' তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, "তুমি আমাদের কাছে এসেছিলে এবং আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলে, তখন আমরা তোমাকে দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার মনে যা এসেছিল, তুমি না বুঝেই তা বলে ফেলেছ। আর তোমার একথায় আমার সাহাবীদের মনে তোমার সম্পর্কে কিছুটা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, এখন তুমি যখন বাইরে যাবে, তখন তাদের সামনে সেটাই বলবে, যা তুমি আমার কাছে বলেছ; যেন তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা দূর হয়ে যায়।" অর্থাৎ সে এবার বলেছিল যে, আপনি সুবিচার করেছেন। রাবী বলেন, যখন সেই বেদুঈন আসে, তখন মহানবী (সা.) বলেন, "তোমাদের এই সঙ্গী আমাদের কাছে এসেছিল এবং আমাদের কাছে চেয়েছিল, তখন আমরা তাকে দিয়েছিলাম। এরপর তার মনে যা এসেছে, সে তাই বলেছে। আমরা তাকে ডেকেছি এবং আরও দিয়েছি, এবং এখন তার ভাষ্য হলো সে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। বিষয়টি কি এমনই?" সেই বেদু ঈন উত্তরে বলে, 'জী হ্যাঁ, আর আল্লাহ্ আপনার পরিবার ও গোত্রের লোকদের পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।' হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর মহানবী (সা.) বলেন, "আমার এবং এই বেদু ঈনের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার একটি উষ্ট্রী আছে কিন্তু সেটি ভড়কে গিয়ে পালিয়ে যায়, আর লোকেরা তার পেছনে ছুটতে আরম্ভ করে, যার ফলে উষ্ট্রীটি আরও বেশি ভড়কে যায়। তখন উষ্ট্রীর মালিক বলে, আমাকে ও আমার উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, কেননা আমি এর সাথে অধিক নম্র আচরণ করতে চাই এবং কীভাবে উষ্ট্রীটি ধরতে হবে সে সম্পর্কে আমি বেশি জ্ঞান রাখি। [তোমরা এর পেছনে ছুটলে এটি আরও ভড়কে যাবে।] এরপর উষ্ট্রীর মালিক সেটির দিকে অগ্রসর হয় এবং তার জন্য কিছু ঘাস নিয়ে তাকে নিজের কাছে ডাকে, [হাতে ঘাস নিয়ে উষ্ট্রীর দিকে যায়,] যেন সেটি তার কাছে আসে এবং এরপর সে তার ওপর জিন চাপিয়ে তাতে আরোহণ করতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, "ঘাস খাওয়ার জন্য (সাধারণত) উষ্ট্রী আসে, সে তা দেখে এগিয়ে আসবে এবং যখন কাছে আসবে তখন সে জিন পরিয়ে দেবে।" অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, "আমি যদি সেসময় তোমাদের কথা মেনে নিতাম, [যখন তোমরা বলেছিলে, এই বেদু ঈনের সাথে কঠোর আচরণ করুন, যখন এই বেদুঈন রূঢ় কথা বলেছিল,] আর আমি যদি তোমাদেরকে তার সাথে কঠোর আচরণ করতে দিতাম, তাহলে সে আগুনে (বা জাহান্নামে) প্রবেশ করত। কিন্তু আমি তাকে রক্ষা করেছি আর এখন সে সন্তুষ্টও হয়ে গেছে।" [মাজমুয়ায়েজ জোয়ায়েদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪১৩-৪১৪]

এই ছিল তাঁর (সা.) দান করার পদ্ধতি। তিনি (সা.) বাড়িতে নিয়ে যান, বাড়িতে গিয়ে দেন। বাইরে এনেও দিতে পারতেন, কিন্তু তাকে দেখিয়ে দেন যে, দেখো, আমার বাড়িতেও এমন কোনো ভোগ -বিলাসের সামগ্রী নেই, কিন্তু যা আছে, তা আমি তোমাকে দিচ্ছি; আর তখন সেই বেদুঈনও আশ্বস্ত হয়।

হযরত রুবায়্যি বিনতে মুআওভিয বিন আফরা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পিতা মুআওভিয বিন আফরা (রা.) আমাকে এক সা' তাজা খেজুর দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠান, যার ওপর ছোটো ছোটো তাজা শসা রাখা ছিল। আর মহানবী (সা.) শসা পছন্দ করতেন। ঠিক সেই সময় মহানবী (সা.)-এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু অলংকার এসেছিল। তিনি (সা.) সেই অলংকারাদি থেকে এক মুঠো ভরে আমাকে দান করেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) আমাকে এক আজলা ভরে অলংকার বা স্বর্ণ দান করেন এবং এরপর বলেন, "এটি পরিধান করো।"

[মাজমুয়ায়েজ জোয়ায়েদ, কিতাব আলামাতুন নবুয়াহ, খণ্ড-৮, পৃ: ৪১০]

এটি হলো সর্বোত্তম উপায়ে প্রতিদান দেওয়া।

খেজুর এবং শসার বিনিময়ে তিনি (সা.) স্বর্ণের অলংকার দান করেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন এমন কোনো ব্যক্তির জানাযা আসত, যিনি ঋণী, তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য কোনো সম্পদ রেখে গেছে কী? লোকেরা যদি বলত হ্যাঁ, তবে তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়তেন, অন্যথায় মু সলমানদের বলতেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ে নাও। আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে (সা.) বিজয় দান করেন, তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি মুসলমানদের কাছে তাদের আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ট। তাই মু'মিনদের মধ্য হতে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে এবং ঋণ রেখে যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে কোনো সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল কিফালাহ, হাদীস-২২৯৮. খণ্ড-৪, পৃ: ২৮০]

[ঋণ থাকলে তা আমি পরিশোধ করব, কিন্তু যদি সে উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পদ রেখে যায়, তবে তা উত্তরাধিকারীদের।]

আবদুল্লাহ্ হওযানী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর মুয়াযিন হযরত বেলাল (রা.)-র সাথে হালাব নামক স্থানে মিলিত হই। আমি বলি, 'হে বেলাল! আমাকে বলুন, মহানবী (সা.)-এর ব্যয় সংস্থান কীভাবে হতো?' তিনি (রা.) বলেন, তাঁর (সা.) কাছে কিছুই থাকত না, আমিই তাঁর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করতাম। আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে (সা.) (মহানবী হিসেবে) প্রেরণ করেন, [আমার বয়আত করার পর থেকে আমিই ব্যবস্থা করতাম] এই অবস্থায়ইমহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন। যখন তাঁর (সা.) কাছে কোনো মুসলমান আসত এবং তিনি (সা.) দেখতেন যে, তার কাছে কাপড় নেই, তখন তিনি (সা.) আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি যেতাম এবং ঋণ নিয়ে তার জন্য চাদর ক্রয় করতাম এবং তাকে পরাতাম আর তাকে আহার করাতাম। এমতাবস্থায় মুশরিকদের মধ্য হতে একজন আমার সাথে দেখা করে এবং সে বলে, 'হে বেলাল! আমার কাছে সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে, তুমি শুধু আমার কাছ থেকেই ঋণ নিও। 'তারপর আমি এমনটিই করতে থাকি। তিনি (রা.) বলেন, একদিন আমি ওযু করি, এরপর আমি আযান দেওয়ার জন্য দাঁড়াই, তখন সেই মুশরিক ব্যবসায়ীদের একটি দল নিয়ে আসে। সে আমাকে দেখে বলতে আরম্ভ করে,

মহান আল্লাহ্র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Waseya Begum, Harhari (Murshidabad)

‘ওহে হাবশী!’আমি বললাম, ‘জী।’ সে আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় এবং আমাকে কঠোর ভাষায় সম্বোধন করে। সে আমাকে বলতে আরম্ভ করে, ‘তুমি কি জানো তোমার ও মাসের (নির্ধারিত সময়ের) মাঝে আর কত দিন বাকি আছে?’ [অর্থাৎ, ঋণ নেওয়ার সময় যে চুক্তি হয়েছিল, বলা হয়েছিল যে, অমুক তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে দেব বা এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করে দেব। তাই সে বলে, তুমি কি জানো আর কত দিন বাকি আছে? হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি বললাম, ‘তা সন্নিকটেই, দিন ঘনিয়ে আসছে, আমি জানি।’“হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি বললাম, সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে, দিনগুলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি তা জানি। তখন সে বলল, তোমার এবং সেই দিনের মাঝে মাত্র চার দিন বাকি আছে। ঋণ পরিশোধের জন্য যে দিন নির্ধারণ করা হয়েছে, তার আর মাত্র চার দিন অবশিষ্ট আছে। আর তোমার পরিশোধযোগ্য যে ঋণ রয়েছে, তার কারণে আমি তোমাকে পাকড়াও করব এবং তোমাকে পূর্বে যে অবস্থায় ছিলে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দেব, অর্থাৎ তুমি মেষ চরাবে। তিনি বলেন, তখন আমার অবস্থা তা-ই হলো, যা মানুষের অন্তরের হয়ে থাকে। হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমার অন্তরে এক বেদনাঘন আবহ সৃষ্টি হলো। আমি এশার নামায আদায় করলাম। মহানবী (সা.) তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে গেলেন। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি রাতে মহানবী (সা.)-এর সকাসে উপস্থিত হলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত হোন। যে মুশরিক ব্যক্তির কাছ থেকে আমি ঋণ নিতাম, সে আমাকে অমুক অমুক কথা বলেছে। আর আমার পক্ষ থেকে পরিশোধ করার জন্য যা যা দরকার তা আপনার কাছে নেই। কারণ আপনি বলতেন অমুককে দাও, অমুককে দাও, এবং ঋণ নিয়ে তাদেরকে দিতাম। এখন পরিশোধ করার জন্য আপনার কাছেও নেই আর আমার কাছেও নেই। আর সে আমাকে অপমান করতে উদ্যত । অতএব আমাকে অনুমতি দিন, আমি সেসবগোত্রের মধ্য থেকে কোনো এক গোত্রের কাছে যাই, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেখানে গিয়ে থাকব, যতক্ষণ না আল্লাহ তা’লা তাঁর রাসুল (সা.)-কে এমন কিছু দান করেন, যা দিয়ে আমার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে বেরিয়ে অর্থাৎ মহানবী(সা.) এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আমার ঘরে পৌঁছলাম। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ার সংকল্প করে আমি আমার তরবারি, থলে, জুতা এবং আমার ঢাল মাথার কাছে রেখে দিলাম । তিনি বলেন, সকালে এক ব্যক্তি দৌড়াতে দৌড়াতে এসে আমাকে ডেকে বলছিল, হে বেলাল! মহানবী (সা.)-এর খেদমতে হাজির হও। তিনি বলেন, আমি চললাম। সফরে যাওয়ার পরিবর্তে, যখন মহানবী (সা.) আমাকে ডাকলেন, তখন আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি মালপত্রে বোঝাই অবস্থায় চারটি উটনী দেখতে পেলাম। আমি সফরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এখন সফরে রওনা হচ্ছি। তখন মহানবী (সা.) আমাকে বললেন, আনন্দিত হও। আল্লাহ তা’লা তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি ওই চারটি বসানো উটনী দেখ নি? আমি বললাম, অবশ্যই দেখেছি। তিনি বললেন, সেই উটগুলো এবং তাদের ওপর বোঝাই করা যা আছে সবই তোমার জন্য। অর্থাৎ ওই উটনীগুলোও তোমার, আর তাদের ওপর যে সম্পদ আছে তাও তোমার। সেগুলোর ওপর কাপড় এবং খাদ্যশস্য রয়েছে, যা ফিদকের প্রধান আমাকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এগুলো নিয়ে নাও এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি তাই করলাম। এরপর আমি মসজিদের দিকে গেলাম। তখন মহানবী (সা.) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম । তিনি বললেন, যে সমস্যার সম্মুখীন ছিলে, তার কী হলো? আমি বললাম, মহানবী (সা.)-এর ওপর যেসব দেনা ছিল, তার সবই আল্লাহ তা’লা পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং কোনো দেনা আর বাকী নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু কি অবশিষ্ট আছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, দেখো, তুমি আমাকে এই সম্পদ থেকেও অব্যহতি দাও। অর্থাৎ যা অবশিষ্ট আছে, তা থেকেও; তা গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দাও। কারণ আমি আমার পরিবারপরিজনের কাছে যাব না, যতক্ষণ তুমি তা বিতরণ করে আমাকে আশ্বস্ত না করবে। মহানবী (সা.) এশার নামাযআদায়ের পর আমাকে ডেকে বললেন, যে কাজটি তোমার করার কথা তা হয়েছে কি, অর্থাৎ যে অবশিষ্ট সম্পদ ছিল এবং যা বন্টন করে দিতে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তার কী হলো? হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আমার কাছে তা নেওয়ার জন্য এখনো কেউ আসে নি। তাই তা এখনো আমার কাছে আগের মতো গচ্ছিতরয়ে গেছে। মহানবী (সা.) সেদিন রাত মসজিদেই কাটালেন। তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে আমিও ঘরে যাব না; মসজিদেই অবস্থান করব। পরদিন যখন তিনি এশার নামায আদায়ের পর তিনি (সা.) আমাকে ডেকে বলেন, তোমারকাজটি হলো কি-না? তিনি বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্ রসুল (সা.)! সেবিষয়ে আপনি এখন আশ্বস্ত থাকতে পারেন। তিনি (সা.) আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সম্পদ বন্টন হয়ে যায়। তিনি (সা.) কোথাও সে সম্পদ তাঁর (সা.) এর কাছে গচ্ছিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু না এসে যায় এ ভয়ে সংকিত ছিলেন। হযরত বেলাল (রা.) বলেন এরপর আমি পেছনে হাঁটতে থাকি যতক্ষণ না তিনি (সা.) তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের নিকট যান ও প্রত্যেককে সালাম করেন। তিনি (সা.) সে স্থানে পৌঁছে যান যেখানে তাঁর রাত্রি যাপন করার কথা ছিল।

[সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, হাদীস-৩০৫৫]

হযরত উম্মে সুনবুলাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সকাশে একটি উপহার নিয়ে উপস্থিত হই, তখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীরা তা নিতে অস্বীকৃতি জানান ও বলেন, ‘আমরা উপহার গ্রহণ করি না।’মহানবী (সা.)ও সেখানে উপস্থিত হন এবং বলেন, উম্মে সুনবুলাহর উপহার গ্রহণ করো কেননা সে আমার গ্রামের লোক আর আমি তার শহরের লোক। অতঃপর তিনি (সা.) তাকে উপহার হিসেবে পুরো একটি অঞ্চল দিয়ে দেন। অর্থাৎ সে উপহারও গ্রহণ করেন ও তাকে উপহারস্বরূপ একটি পুরো অঞ্চল প্রদান করেন।[উসদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ:৩৩৬]

যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি (সা.) সামান্য উপহারের বিনিময়ে অঢেল (উপহার) প্রদান করতেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে যে জায়গা পর্যন্ত তার ঘোড়া পৌঁছুতে পারে তা জায়গীরস্বরূপ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, ঠিক আছে, তোমার ঘোড়া হাঁকাও আর যে জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে তা থেমে যাবে সে পুরো জায়গা তোমার। (বিভিন্ন অঞ্চল) বিজয়ের পর অনেক বিস্তৃর্ণ অঞ্চল হস্তগত হয়েছিল। তিনি তার ঘোড়া হাঁকান এরপর একটি স্থানে গিয়ে তা থেমে যায়। যখন ঘোড়াটি থেমে যায় তখন তিনি আরো কিছু জায়গা চাচ্ছিলেন , সেটি পাওয়ার জন্য তার হাতের চাবুকটি ছুঁড়ে মারেন। সেটি অনেক দূর গিয়ে পড়ে তখন তিনি (সা.) বলেন, তাকে সে পর্যন্ত জমি দিয়ে দাও যেখানে তার চাবুকটি পৌঁছেছে। [সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, হাদীস-৩০৭২

হযরত জুবায়ের বিন মুতয়ি’ম (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে যাচ্ছিলেন। তাঁর (সা.) সাথে আরো অনেক লোকও ছিল। এটি সে সময়কার ঘটনা যখন তিনি (সা.) হুনায়ন থেকে ফেরত আসছিলেন। কতিপয় গ্রাম্য লোক পথিমধ্যেই তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর (সা.) কাছে (জোরপূর্বক) সম্পদ চাইতে থাকে। তারা তাঁকে এতটাই জোরাজুরি করতে লাগলো যে, তিনি (সা.) একটি বাবলা গাছের দিকে সরে যেতে বাধ্য হলেন। ফলে তাঁর চাদর (বাবলা) গাছে আটকে যায় ও তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে যান। আর কোন কোন রওয়ায়েত অনুসারে, যখন চাঁদর আটকে যায় তখন তারা তা টানতে থাকে। ফলে তাঁর (সা.) এর গলায় দাগও পড়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, আমার চাঁদর দিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এ কাটাবহুল বৃক্ষের সমসংখ্যক অর্থ -সম্পদও থাকতো, আমি নিঃসন্দেহে তা তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিতাম এবং তোমরা আমাকে কখনো কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও ভীতু পেতে না। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস-২৮২১]

এ ঘটনাটি বর্ণনা করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধ শেষে সে-সকল সম্পদসমূহ যা পরাজিত শত্রুদের জরিমানা থেকে লব্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের রেখে যাওয়া জিনিসপত্রগুলোর মাধ্যমে একত্রিত হয়েছিল, তা নিয়মানুযায়ী মহানবী (সা.)-এর ইসলামী সৈন্যদলের মাঝে বন্টন করার কথা ছিল; কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি (সা.) সে সম্পদসমূহ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করার পরিবর্তে মক্কাবাসী ও আশপাশের লোকদেরকে বন্টন করে দেন। তাদের মাঝে তখনো ঈমান প্রথিত হয় নি। অনেকে তো তখনো অবিশ্বাসী ছিল আর যারা মুসলমান ছিল, তারাও সবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এটি তাদের জন্য পুরোপুরি নতুন বিষয় ছিল যে, একটি জাতি তাদের (লব্ধ) সম্পদ অন্যদের মাঝে বন্টন করে দিচ্ছে। এ সম্পদ বিতরণের ফলে তাদের হৃদয়ে পুণ্য, খোদাভীতি সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে লোভ আরো বেড়ে যায়।তারা মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে ভিড় করে এবং আরও দাবি-দাওয়া করে তাঁকে বিরক্ত করতে আরম্ভকরল। এমনকি তারা ধাক্কাতে ধাক্কাতে তাঁকে একটি বৃক্ষ পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং একজন তো তাঁর চাদর, যা তাঁর কাঁধে ছিল সেটি ধরে এমনভাবে মোচড়াতে শুরু করে, যার ফলে তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকেরা! আমার কাছে যদি

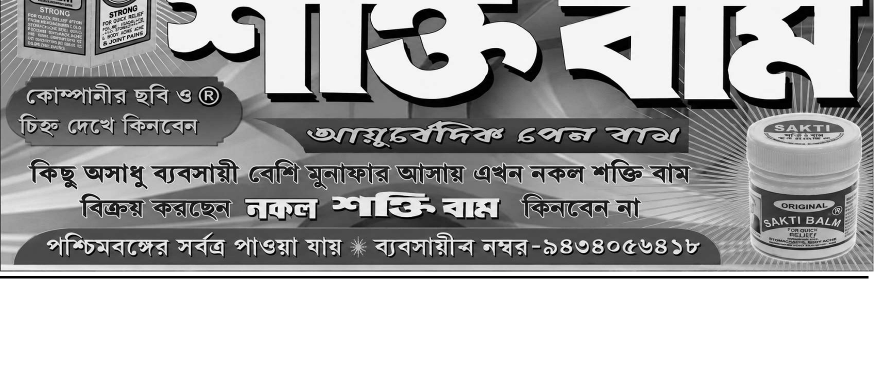

আরও কিছু থাকত তাহলে আমি তাও তোমাদের দিয়ে দিতাম, আর তোমরা আমাকে কখনো কৃপণ অথবা ভিরু প্রকৃতির পাবে না।

এরপর তিনি (সা.) তাঁর উটনীর কাছে যান এবং সেটির একটি পশম ছিঁড়ে সেটিকে উঁচু করে ধরেন আর বলেন, হে লোকেরা! তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে আমার এই চুল পরিমাণেরও প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র সেই খুমস বা পঞ্চমাংশ ব্যতীত যা আরবের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রাপ্য। আর সেই পঞ্চমাংশও আমি নিজের পেছনে জন্য খরচ করি না, বরং সেটাও তোমাদের প্রয়োজনেই ব্যয় করা হয়। স্মরণ রেখো, খেয়ানতকারী বা বিশ্বাসঘাতক কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ র দরবারে এই খিয়ানতের কারণে লাঞ্ছিত হবে।

তিনি (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, লোকেরা বলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্(সা.) রাজত্বের জন্য লালায়িত ছিলেন। বাদশা ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কি এমনই হয়ে থাকে? কারো কি ক্ষমতা আছে যে, বাদশাকে এভাবে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাবে এবং তঁ ার গলায় চাদর পেঁচিয়ে সেটিকে হ্যাঁচকা টান দেবে? আল্লাহ্ র রসূলগণ ব্যতীত এই আদর্শ আর কে দেখাতে পারে? " (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৫৭-৩৫৮]

তিনি (সা.) তবুকের যুদ্ধে একটি খুবই সুন্দর ঘোড়া লাভ করেন। সেটির আওয়াজ তাঁর খুব ভালো লাগত। তাঁর কাছে একজন আনসারী সাহাবী বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি এই ঘোড়াটি আমাকে দিয়ে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, এটি তোমার।

[শারফুল মুস্তফা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯, হাদীস-১০৪০]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজের সেই রোগের সময় যাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, বলেন, হে আয়েশা! স্বর্ণের কী হলো? তিনি স্বর্ণের পাঁচ অথবা সাত অথবা আট নয়টি মুদ্রা তাঁর (সা.) সমীপে নিয়ে আসেন, যেগুলো ঘরে রাখা ছিল। তিনি (সা.) সেগুলো নিজের হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে বলেন, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লাকে কীভাবে মুখ দেখাবেন যে, তিনি আল্লাহ্ র সাথে সাক্ষাৎ করছেন অথচ এই স্বর্ণ তার কাছে রয়েছে? হে আয়েশা (রা.)! এগুলো খরচ করে ফেলো, অর্থাৎ বণ্টন করে দাও।

[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫৩, হাদীস-২৪৭২৬]

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, মহানবী (সা.) একবার নিজের বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের ঘরে কী আছে? আয়েশা (রা.) দুটি আশরাফি বা স্বর্ণমুদ্রা বের করে দেন আর বলেন, এগুলোই আছে। মহানবী (সা.) সেগুলো হাতের তালুতে রেখে বলেন, সে নবীর অবস্থা কেমন হবে যে নিজের অবর্তমানে দুটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যায়? অতঃপর তখনই তা বণ্টন করে দেন।" [মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮১]

হুনাইনের মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিবরণে বর্ণিত হয়েছে, ছয় হাজার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে অর্জিত হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে আট হাজারও বর্ণিত হয়েছে। চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারের বেশি ভেড়া-ছাগল এবং চার হাজার উকীয়া রুপা যা প্রায় চারশ নব্বই কিলোগ্রাম হয়। এক উকীয়া সাড়ে দশ তোলার সমপরিমাণ হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) মানুষের মনস্তুষ্টির মাধ্যমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করার সূচনা করেন। তারা আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন আর নিজ নিজ গোত্রে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উপহার দেন। তিনি (সা.) তাদের মাঝে কাউকে একশ উট, কাউকে পঞ্চাশটি উট দেন; রুপা ও ক্রীতদাস এর বাইরে ছিল। আবু সুফিয়ান বিন হারবকে এ কশটি উট দেন। আবু সুফিয়ান যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন তখন তাঁর (সা.)-এর সামনে রুপার একটি স্তূপ দেখে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনি তো আজ কুরাইশের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী হয়ে গেছেন। একথা শুনে তিনি (সা.) মুচকি হাসেন এবং আবু সুফিয়ানকে চল্লিশ উকীয়া রুপা ও একশটি উট প্রদান করেন। আবু সুফিয়ান তখন বলেন, আমার ছেলে ইয়াযীদকেও কিছু দান করুন। তখন তিনি (সা.) তাকেও চল্লিশ উকীয়া রুপা ও একশটি উট দেওয়ার নির্দেশ দেন। এখানে যে ইয়াযীদের কথা বলা হচ্ছে তিনি আবু সুফিয়ানের ছেলে। তিনি সেই কুখ্যাত ইয়াযীদ নন, যার কথা সাধারণত বলা হয়। সেই ইয়াযীদ ছিল আবু সুফিয়ানের পৌত্র অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়ার পুত্র ছিল। যাইহোক, আবু সুফিয়ান বলেন, হে আল্লাহ্ র রসু ল (সা.)! আমার আরেক পুত্র মুয়াবিয়াকেও কিছু দান করুন। তখন তাকেও চল্লিশ উকীয়া রুপা ও একশটি উট দেবার নির্দেশ দেন। তখন আবু সুফিয়ান বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আপনি অত্যন্ত মহান। আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, আর আপনি কতই-না উত্তম যোদ্ধা। এরপর আমি আপনার সঙ্গে সন্ধি করেছি, আর আপনি কতই-না উত্তম সন্ধিকারী। আল্লাহ্ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।

[শারাহ আল্লামা যারকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮-১৯] [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৬] [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮৯]

তাঁর (সা.) দান ও অনুগ্রহে ধন্য ব্যক্তিদের মধ্যে মক্কার অন্যতম নেতা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াও ছিলেন। ইনি সেই সাফওয়ান, যার কাছ থেকে তিনি (সা.) হুনাইনের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বর্ম ও অস্ত্র শস্ত্র ধার নিয়েছিলেন।আর তিনি মুশরিক অবস্থায়ই হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধেই তাঁর হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় মহান বী (সা.) তাকে একশটি উট প্রদান করেন।

আর সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) তাকে তিনশ উট প্রদান করেছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, সেই দিনগুলোতেই মহানবী (সা.) এমন একটি উপত্যকা পার হচ্ছিলেন যেখানে গনিমতের উট ও ছাগল ছিল এবং সেই উপত্যকা উট ও ছাগপালে পরিপূর্ণ ছিল।

সাফওয়ান বিস্ময়ের সঙ্গে সেই বিপুল সম্পদ দেখছিলেন। মহানবী (সা.) তখন তাকে বলেন, হে আবু ওয়াহাব! এটি ছিল সাফওয়ানের উপনাম এই উপত্যকা কি তোমাকে বিস্মিত করেছে? তিনি বলেন, জি হ্যাঁ। মহানবী (সা.) তখন বলেন, এই সমস্ত সম্পদ তোমার। তুমি এগুলো নিয়ে নাও। সাফওয়ান অবলিলায় বলে উঠেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। কারণ এমন দান কেবল একজন নবীই করতে পারেন।

অন্য আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া স্বয়ং বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে এত পরিমাণ দান করতে থাকেন যে, এর পরিণামে প্রথমে তিনি আমার কাছে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু পরে তিনিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে যান।

মোটকথা, তিনি আরবের বিভিন্ন নেতাকে দান করতে থাকেন। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ জনেরও বেশি বলে বর্ণিত হয়।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-২৩১৩] [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৬]

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে বিপুলসংখ্যক ভেড়াছাগল ছিল। একজন কাফির বলে, আপনার কাছে এত ভেড়া-ছাগল মজুদ রয়েছে যা রোম ও পারস্য সম্রাটের কাছেও নেই। তখন তিনি সবকিছুই তাকে দিয়ে দেন। সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ঈমান আনে এবং বলে, একজন নবী ছাড়া আর কেউ এমন মহান উদারতা প্রদর্শন করতে পারে না। " [মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৫]

এরপর মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-কে অবশিষ্ট লোকদের ডেকে আনার নির্দেশ দেন এবং অবশিষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। প্রত্যেকের ভাগে চারটি উট অথবা চল্লিশটি ছাগল পরেছিল। সে সময় পর্যন্ত অর্জিত সর্বাধিক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পূর্ণরূপে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন।

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের এই দিকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে এবং তাঁর (সা.) যুদ্ধ সম্পর্কে এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, মুসলমানরা দরিদ্র ছিল এবং ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিল; এ কারণেই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়েছিল।এ কথায় যদি বিন্দুমাত্র সত্যতাও থাকত, তাহলে হুনাইনের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টন ভিন্নভাবে হতো। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি বড়ো অংশ অমুসলিমদের মন জয় করার নিমিত্তে দান করা হয়েছিল। কুরাইশ নেতাদেরও দেওয়া হয়েছে। বরং কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী সমস্ত সম্পদই অন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল।

[শারাহ যারকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭] [দায়েরায়ে মারেফ,সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮৯ ,৩২২-৩২৩] [সীরাতুন নবী, প্রণেতা- শিবলী নুমানি, ১ম ভাগ, পৃ: ৩৯৬ , ৪র্থ ভাগ, পৃ: ২৪৭]

যদিও এর পিছনে আরও কিছু হিকমত ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য থেকে থাকবে, তবে এটি তো জগদ্বাসী দেখেছে যে, তিনি (সা.) নিজের জন্য কিছুই রাখেন নি। এমনকি তাঁর নিবেদিত প্রাণ ও বিশ্বস্ত সাথী, অর্থাৎ মদীনার আনসারদেরও এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে কিছুই দেন নি বা অতি সামান্যই দান করেছেন।

হুনাইনের যুদ্ধের দিন একজন মহিলা আসেন এবং কয়েকটি পঙক্তি পাঠ করেন, যেখানে তিনি হাওয়াযিন গোত্রে তাঁর (সা.) দুধপান করার দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। তখন তিনি (সা.) হাওয়াযিনদের কাছ থেকে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ফিরিয়ে দেন এবং তাদের আরও অধিক দান করেন। এমনকি তিনি তাদের যা দিয়েছিলেন এর মূল্য নির্ধারণ করা হলেতা পাঁচ লক্ষ দিরহামের সমপরিমাণ ছিল। ইবনে দিহইয়া বলেন, এটি দানশীলতার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল। এমন দানশীলতার কথা কখনো শোনা যায়নি।

[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খণ্ড-৭, পৃ: ৫১]

যখন হাওয়াযিনের প্রতিনিধিরা মুসলমান হয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন এবং তারা তাদের সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে, তখন মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে বলেন, সত্য কথা আমার কাছে খুবই প্রিয়। দুটির যে কোনো একটি বেছে নাও। হয় বন্দীদের ফিরিয়ে নাও, নয়তো সম্পদ।

আমি তো তোমাদের জন্য জিরানায় অপেক্ষা করেছিলাম। আর প্রকৃত অর্থেই তিনি (সা.) তায়েফ থেকে ফেরার পর দশ রাতেরও বেশি সময় জির নায় তাদের জন্য অপেক্ষা করেন, যাতে তারা এসে তাদের সম্পদ ও বন্দীদের দাবি করতে পারে। যখন তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, মহানবী (সা.) দুটির একটিই ফেরত দিবেন এর বেশি দিবেন না, তখন তারা বলল, তাহলে আমরা আমাদের বন্দীদের নেব। তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র এমন গুণকীর্তন করেন যার মর্যাদা তিনি রাখেন। এরপর তিনি বলেন, তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে এসেছে। আর আমি সঙ্গত মনে করছি যে, তাদের বন্দীদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দেবো। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিতে চায় সে দিয়ে দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে নিজের অংশে অটল থাকতে চায়, সে-ও ফিরিয়ে দিক। আল্লাহ্ পরবর্তীতে আমাদের যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিবেন, তা থেকে আমরা তার প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবো। লোকেরা বলল, মহানবী (সা.)-এর সন্তুষ্টির জন্য আমরা স্বেচ্ছায় এই বন্দীদের ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের কোনো অংশের প্রয়োজন নেই।

মহানবী (সা.) বলেন, আমরা জানি না যে, তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিয়েছে আর কে দেয় নি। তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতারা তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে উপস্থাপন করুক। এতে লোকেরা ফিরে যায়। এখানে তিনি (সা.) অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে বলেন, তোমাদের নেতাদের পাঠাও, তাদের মাধ্যমে জানাও যে, তোমরা সত্যিই বন্দীদের ফিরিয়ে দিচ্ছ। তখন তাদের নেতারা তাদের সাথে কথা বলেন এবং পরে মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে এসে জানান যে, সকলে স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে এবং বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। আর এভাবে তিনি (সা.) কোনো ধরনের মুক্তিপণ ছাড়াই হাওয়াযিনের বন্দীদের মুক্ত করে দেন।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওয়াকালাহ, হাদীস-২৩০৭-২৩০৮]

আর তাদের শুধু মুক্তই করেন নি বরং তাদের নতুন পোশাকও প্রদান করেন। পোশাক ক্রয়ের জন্য তিনি (সা.) একজন সাহাবিকে বিশেষভাবে মক্কায় পাঠান এবং তাকিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন যে, فَلَا يَخْرُجَ الْحُرُّ مِنْهُمْ إِلَّا كَاسِيًا অর্থাৎ, তাদের মধ্য থেকে কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেন পোশাক ছাড়া না যায়।

[আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮১]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন লোকেরা তাঁর (সা.)-কাছে এসে চাইতে লাগল এবং তিনি (সা.) তাদেরকে তাঁর ছাগল, ভেড়া এবং উটের মধ্য থেকে দান করতে থাকেন, এমনকি কোন কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন- তোমরা কী চাও? তোমরা কি চাও আমি কৃপণ হয়ে যাব? আল্লাহ্‌র কসম! আমি কৃপণ নই, না আমি ভীরু এবং আমি মিথ্যুকও নই।

[সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৩]

এই প্রেক্ষাপটে আমরা এটিও দেখতে পাই যে, তাঁর (সা.) উদারতা ও দানশীলতাও অনুপযুক্ত স্থানে হতো না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি (সা.) যাচনা কারীদেরকে দান করতেন এবং কখনো বারণ করতেন না। কিন্তু কখনো কখনো তিনি (সা.) যাচনাকারীদেরকে বিচক্ষণতার সাথে বারণও করেছেন এবং এর পেছনে অনেক কল্যাণকর উদ্দেশ্য নিহিত থাকত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদা তিনি (সা.) মানুষের মাঝে ধনসম্পদ বিতরণ করছিলেন এবং মানুষকে দান করে যাচ্ছিলেন আর এক ব্যক্তিকে উপেক্ষা করছিলেন এবং তাকে কিছুই দেন নি। হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন যে, সেই ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় আমার বেশি পছন্দের ছিল। আমি চেয়েছিলাম অন্যদের বাদ দিয়ে হলেও সে যেন পায়। এ জন্য আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনি অমুককে কেন বাদ দিয়েছেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তাকে মু'মিন মনে করি। মহানবী (সা.) বলেন, অথবা মুসলিম। হযরত সা'দ বলেন, আমি তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম তারপর আমি তার সম্পর্কে যা কিছু জানতাম তা আমাকে আবারো বলতে বাধ্য করলো এবং আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম আর নিবেদন করলাম, আপনি অমুককে বাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তাকে মু'মিনই মনে করি। তিনি (সা.) বলেন, অথবা মুসলিম। অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা কিছু জানতাম তা আমাকে আবারো বলতে বাধ্য করলো এবং আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম আর মহানবী (সা.) সেই জবাবই দিলেন।

এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে সা'দ! আমি কোনো এক ব্যক্তিকে এই আশায় দান করি যেন আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ না করেন, যদিও বা অন্য ব্যক্তি আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-২৭]

তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু এর পেছনে আরো অনেক প্রজ্ঞাগত কারণ রয়েছে। সেই কারণেই আমি দান করি যেন তাদের ঈমান একটু হলেও দৃঢ় হয়। কতক ব্যক্তি উপঢৌকন বা পার্থিব সুবিধা ভোগের পরই নিজের ঈমানে দৃঢ় হয়, যেভাবে অনেক উদাহরণ পূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে।

হযরত জয়নুল আবেদীন সৈয়দ ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব (রা.)-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "মুমিনান" অথবা "মুসলিমান"। ইমাম বুখারী এখানে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এর মাধ্যমে তিনি ঈমান এবং ইসলামের মধ্যকার প্রকৃত পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। অর্থাৎ, ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ অবস্থার নাম আর ইসলামের সম্পর্ক হলো বাহ্যিকতার সাথে। এ জন্য মহানবী (সা.) শিষ্টাচার শিখিয়েছেন যে, কারো সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অন্তরের জ্ঞান নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লাই রাখেন। যে সাহাবীকে তিনি (সা.) দান করা অনুপযুক্ত মনে করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত জুআইল বিন সুরাকা, যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুহাজের সাহাবী ছিলেন। মহানবী (সা.)-ও তাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-এর বার বার জোর দেয়ার কারণে তাকে এই শিষ্টাচার শিখিয়েছেন এবং সেই পার্থক্যটি বজায় রাখার শিক্ষা দিয়েছেন যা প্রকৃতপক্ষে ঈমান এবং ইসলামের মাঝে রয়েছে। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) দুর্বল লোকদের খেয়াল রাখার শিক্ষাও দিয়েছেন যেন এমনটি না হয় যে, সে তার দুর্বলতার কারণে হোঁচট খায়। একটি দুর্বল চারা গাছের যেভাবে যত্ন নেয়া প্রয়োজন হয়, একটি বড় বৃক্ষের ততটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। মহানবী (সা.) মানুষের ঈমানকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য অতি সামান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। এ ব্যাপারে কিছু অজ্ঞ লোক অত্যন্ত ভুল কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। একজন হোঁচট খাওয়া ব্যক্তিকে সকল এমন বিষয় থেকে রক্ষার পরিবর্তে যা হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়, তারা নিজেরাই তার হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়ে যায়। আর সহানুভূতি সুলভ আচরণ করার পরিবর্তে সেই দুর্বলদের ঈমানের ওপর প্রকাশ্য আক্রমণ করে বসে। এটি কতক লোকের অভ্যাস হয়ে থাকে আর এভাবে তাদেরকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা আরো বেশি পিছিয়ে পড়ে। সুতরাং এই বিষয়টি আমাদেরকে মনে রাখা উচিত। মহানবী (সা.) এই বিষয়ে এতটাই সতর্ক ছিলেন যে, তিনি অন্যদের সামনে কারো ঈমানের বিশেষভাবে প্রশংসা করতেও নিষেধ করতেন। শুধু এই কারণে নয় যে, কখনো কখনো সামনা সামনি প্রশংসা করা প্রশংসিত ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, বরং এই কারণেও যে, কখনো কখনো একটি বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয়ের তুলনা করতে গিয়ে অপর ব্যক্তির ঈমান ও আচরণের ওপরও আক্রমণ করা হয়। তিনি (সা.) এই একটি ঘটনার মাধ্যমে চারটি বিষয় শিক্ষা দিয়ে ছেন। শাহ সাহেব লিখেছেন যে, এই চারটি বিষয় হলো- ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা এবং ঈমান আনয়ন করার মাঝে পার্থক্য কী? একটি হলো বাহ্যিক বিষয় আর অন্যটি অন্তরের বিষয়। দ্বিতীয়ত, শব্দ যথাস্থানে ব্যবহার করা। অর্থাৎ কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। তারপর তৃতীয়ত, বিধর্মীদের প্রতি যত্নবান হওয়া, অর্থাৎ মনস্তুষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যে, কার দ্বারা কারো কী উপকার হচ্ছে। চতুর্থত, বিনা চিন্তাভাবনায় এমনভাবে কারো প্রশংসা না করা, যার ফলে অন্যের ঈমান বা আচরণের ওপর আক্রমণ করা হয়। [সূত্র: সহীহ বুখারী, অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭০]

মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি ঘটনাই প্রজ্ঞা ও সংশোধনের ধনভাণ্ডার। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর (সা.)-এর মাঝে পরম পর্যায়ের ভারসাম্য ছিল এবং প্রতিটি নৈতিক চরিত্র যথাস্থানে প্রকাশিত হতো। আর সেসব মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে মহানবী (সা.)-এর উদারতাও যথাস্থানে ছিল, অর্থাৎ পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী ছিল। আর পরার্থপরতাও যথাস্থানে ছিল এবং দয়াও যথাস্থানে ছিল। [বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৪-১৯৫]

মহানবী (সা.)-এর উদারতা ও বদান্যতার অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। এগুলোর মাঝেই আমরা তাঁর (সা.) চরিত্রের অন্যান্য দিকও দেখতে পাই।

যাইহোক, যেভাবে তাঁর শিক্ষামালা ভারসাম্যপূর্ণ, তেমনি তাঁর প্রতিটি কাজও ছিল সে অনুযায়ী ভারসাম্যপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও তাঁর জীবনচরিতের প্রতিটি দিক নিয়ে চিন্তা করার এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি।

(আমীন)

সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছেন, "তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খিলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন কর এবং খিলাফতের এ নেয়ামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেয়ামে খিলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।" (দরসে কুরআন, পৃ. ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১)

তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহ

হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রা.)

তাকওয়ার পথ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণ

একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে প্রথম বা প্রাথমিক পথ শরীয়ত নির্ধারণ করেছে, তা হলো তাকওয়া; অর্থাৎ আল্লাহভীতির কারণে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এর পরবর্তী ও উচ্চতর স্তর হলো 'মুহসিন' হওয়া, অর্থাৎ সেই পথ, যেখানে একজন মুমিন আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রেমের কারণে নেককাজে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করে।

'তাকওয়া' শব্দটি আমাদের জামাআতের ছোট-বড় সকলের মুখেই শোনা যায়। কারণ এটি আহমদিয়া জামাআতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, সত্যিই এই অমূল্য সম্পদ আজ পৃথিবীর আর কোথাও সহজলভ্য নয়।

কিন্তু এই শব্দটির এত বেশি ব্যবহার ও বারবার স্মরণ করানো সত্ত্বেও, এটিকে যথাযথভাবে বোঝা এবং তার ওপর আমল করার যে অধিকার ছিল, তা পূর্ণভাবে আদায় হয়নি। তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথের কথা তো দূরের কথা, অনেকেই এর প্রশস্ত ও প্রধান পথগুলোর সঙ্গেও পরিচিত নন।

এর কারণ হলো, সামগ্রিক ধারণা থাকলেও এর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জিত হয়নি। আর এই জ্ঞান কেন অর্জিত হয়নি? কারণ, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অথবা হযরত খলীফাতুল মসীহ (আ.)-এর সাহচর্য অধিক পরিমাণে লাভ হয়নি, তাঁদের পবিত্র জীবনধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি এবং কেবল বায়আতের একটি পত্র বা কিছু সাহিত্য অধ্যয়ন করাকেই আহমদিয়াতের জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অথবা সর্বোচ্চ বার্ষিক জলসা কিংবা কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়াকেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত বলে মনে করা হয়েছে।

কিন্তু এর বিপরীতে, যে ব্যক্তি এই পবিত্র সাহচর্যের সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তার জন্য আপনাআপনিই মারিফাতের দরজাগুলো খুলতে শুরু করে। তাকওয়ার প্রধান পথগুলো অতিক্রম করার পর আল্লাহ তাআলা এমন বান্দাদেরকে তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে পরিচালনার জন্য সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন। তখন আসমান থেকে এক নূরে মারিফাত ও ইলমে লাদুন্নী তাদের অন্তর ও মস্তিষ্কে প্রবাহিত হতে থাকে। যে বিষয় তাকওয়ার পরিপন্থী, তা থেকে তাদের বিরত রাখা হয় এবং যা তাকওয়ার অনুকূল, তার প্রতি উৎসাহ বা অনুমতি প্রদান করা হয়।

সেই সময় মানুষের অবস্থা এই পার্থিব জগতের সাধারণ মানুষের অবস্থা থেকে অনেক উচ্চ ও উন্নত হয়ে যায়। পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিতে যেসব কাজ বা চিন্তা সাধারণ ও নির্দোষ বলে মনে হয়, সে সেগুলোর মধ্যেও বিপদ ও ধ্বংস দেখতে পায়। তার যেন দুই চোখের পরিবর্তে চারটি চোখ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের জন্য যে বিষয়টি নেককাজ, তা কখনও কখনও তার জন্য অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আর এ ধরনের প্রদর্শনমূলক নেককাজ থেকেও সে ঠিক তেমনি বেঁচে থাকে, যেমন সাধারণ মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

এমন অবস্থায় সে সেই বরকতময় সত্তার ছায়াতলে প্রবেশ করে, যিনি ঘোষণা করেছিলেন–

من تربیت پذیر ز رب مہیمن ام

"আমি মহান প্রতিপালকের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।"

মুত্তাকীর অন্তর্দৃষ্টি

তবে এই অবস্থার বা এর চেয়েও উচ্চতর অবস্থার পূর্বেই, একজন প্রাথমিক পর্যায়ের মুত্তাকীর নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টিও অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুধাবনে তার উপলব্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। সমাজে যেসব বিষয় সাধারণভাবে নির্দোষ বলে গণ্য হয় এবং প্রকাশ্যেই প্রচলিত থাকে, সেসব থেকেও সে বিরত থাকতে শুরু করে। কারণ, তার মধ্যে কৃত্রিম তাকওয়া নয়, বরং প্রকৃত তাকওয়ার সেই আত্মা বিদ্যমান থাকে, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন–

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, "তোমরা যদি আন্তরিকভাবে তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ নিজেই তোমাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, আর তখন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।"

অতএব, তারা সেই অবস্থায় উপনীত হয়। অবশ্য এটি জরুরি নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো বিষয়ের বৈধ বা অবৈধ হওয়ার সব বিশদ যুক্তি ও প্রমাণও জেনে যাবে। তবে এটুকু অবশ্যই ঘটে যে, একজন মুত্তাকী বৈধ ও অবৈধ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার বিশেষ অনুভূতি লাভ করে। সে যেমন একজন দক্ষ জহুরি আসল মুক্তা ও নকল মুক্তার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, তেমনি সহজেই ভালো কাজ ও মন্দ কাজকে পৃথক করতে পারে। আর আল্লাহর অবাধ্যতা যদি আপাতদৃষ্টিতে খুবই সুন্দর কাজের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তবে সে ঠিক তেমনি তা অনুভব করতে পারে, যেমন আমরা মৃতদেহের দুর্গন্ধ অনুভব করি।

তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথ অনুসরণের অর্থ

এখন আমি মূল বিষয়ে আসছি। অর্থাৎ, কিছু উদাহরণের মাধ্যমে তাকওয়ার সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর আলোচনা করব, যাতে আগ্রহী ব্যক্তিরা এ পথ সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় খুব বেশি সূক্ষ্ম নয়। তবে শিক্ষানবীশদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এগুলোকে সূক্ষ্মই বলব। কারণ, সাধারণত মানুষ হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মিথ্যাচারকেই বড় গুনাহ মনে করে।

কিন্তু আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, এসব গুনাহরই এত শাখা-প্রশাখা ও এত রকমের সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে যে, সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না এগুলোও গুনাহ কি না। কারণ, এসব সূক্ষ্ম ও লুকানো রূপ সমাজে এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কেউ এগুলোকে আর দোষের বিষয়ই মনে করে না। বরং যে ব্যক্তি এসব সূক্ষ্ম গুনাহ নির্দ্বিধায় করে এবং আরও দক্ষতার সঙ্গে তা করার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে, সমাজের দৃষ্টিতে তাকেই বুদ্ধিমান, চতুর ও দূরদর্শী বলে গণ্য করা হয়।

পবিত্র কুরআন এই সূক্ষ্ম গুনাহগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে এক স্থানে বলেছেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ

অর্থাৎ, "শুধু প্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকেই নয়, বরং সেইসব অশ্লীলতা থেকেও দূরে থাকো, যা সূক্ষ্ম, গোপন এবং মানুষের অন্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকে।"

অনুরূপভাবে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও বলেছেন যে, শুধু মানুষের যৌনাঙ্গই ব্যভিচার করে না; তার চোখও ব্যভিচার করে, কানও ব্যভিচার করে, হাতও ব্যভিচার করে, পা-ও ব্যভিচার করে এবং তার অন্তরও ব্যভিচার করে।

অর্থাৎ, এই হাদিসে একটি সুপরিচিত ও বড় গুনাহর বিভিন্ন শাখা ও সূক্ষ্ম পথও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য গুনাহর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

যেমন, কারও বাড়িতে সিঁধ কেটে তার অলঙ্কার চুরি করাকে সাধারণ মানুষ চুরি বলে। কিন্তু একজন আহমদী ছাত্রের দৃষ্টিতে পরীক্ষার খাতায় নকল করাও চুরি।

আবার, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করা যেমন আত্মহত্যা, তেমনি একজন মুত্তাকী আহমদী রোগীর দৃষ্টিতে এমন খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করা, যার ফলে রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা থাকে, সেটিও এক ধরনের আত্মহত্যা।

আবার, যেমন একজন মানুষকে হত্যা করা পার্থিব মানুষের দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর অপরাধ, তেমনি একজন আহমদী স্বামীর দৃষ্টিতে শরিয়তের প্রয়োজন ছাড়াই জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অবলম্বন করাও একই ধরনের গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এভাবেই অন্যান্য বিষয়ও বিচার্য।

যদি একজন সাধারণ মুসলমানের কাছে ব্যভিচার একটি বড় গুনাহ হয়, তবে একজন আহমদী যুবকের কাছে বৈধ ও হালাল পন্থা ছাড়া অন্য যেকোনো উপায়ে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করাও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথ অনুসরণের অর্থ হলো-আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর ভয়ের কারণে সেইসব গুনাহও পরিত্যাগ করা, যেগুলো সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকলে বা যেগুলো কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। যেগুলোর ব্যাপারে দুনিয়াবি বুদ্ধি বৈধতার ফতোয়া দিতে পারে, কিন্তু একজন মুত্তাকীর বিবেক কখনও তার অনুমতি দেয় না।

মনে রাখা উচিত, সাধারণ মানুষকে শুধু এই বলে দিলেই বিষয়টি বোঝা যায় না যে, "হত্যা করো না, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না এবং মিথ্যা বলো না।" বরং যখন এসব বিষয়ে কিছু সূক্ষ্ম বিবরণও তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তখনই তারা বিষয়টি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

কারণ, মানুষের মনে যতটা জ্ঞান উদাহরণ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রবেশ করে, ততটা কখনো সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রবেশ করে না। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে একই বিষয়কে বিভিন্ন ভাষাশৈলী, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকেও বিভিন্নভাবে সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

এই ভূমিকার পর এখন আমি মুত্তাকীদের কিছু নমুনাস্বরূপ কাজ ও আচরণের উল্লেখ করছি। আর আরও বিস্তারিত বিষয় পাঠকদের নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।

(চলবে)...

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

(পূর্বের সংখ্যার পর...)

মহানবী (সা.) বলেছেন, সেই আগত ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্য থেকেই আসবেন। হাদিসে আছে, যখন তাঁর ওপর সূরা জুমুআ নাযিল হয় এবং তিনি وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, তখন একজন সাহাবি জিজ্ঞাসা করেন, এরা কারা? তখন মহানবী (সা.) হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও পৌঁছে যায়, তবুও এদের মধ্য থেকে কিছু লোক তা ফিরিয়ে আনবে।'

এই হাদিস থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়-প্রথমত, আগত ব্যক্তি আরব হবেন না; দ্বিতীয়ত, তিনি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, 'তাঁর আগমনই আমার আগমন।' অর্থাৎ তিনি আমার আদর্শ অনুসরণকারী ও আমার অনুগামী হবেন।

আমরা বিশ্বাস করি, মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আ.) মসীহ ও মাহদি হিসেবে আগমন করেছেন। তিনি কোনো নতুন শরিয়ত নিয়ে আসেননি; বরং পবিত্র কুরআনের শরিয়তের সৌন্দর্য ও প্রকৃত শিক্ষা ব্যাখ্যা করার জন্য এসেছেন। মহানবী (সা.)-এর পরে নবী আসতে পারেন, তবে তিনি হবেন শরিয়তবিহীন নবী। আমাদের আকিদা হলো, মহানবী (সা.) খাতামুন নবিয়্যীন, পবিত্র কুরআন সর্বশেষ কিতাব এবং এর পরে আর কোনো নতুন শরিয়ত আসবে না। আমরা মহানবী (সা.)-কে শেষ যুগের নবী ও খাতামুন নবিয়্যীন হিসেবে মানি এবং এও বিশ্বাস করি যে, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও অনুসরণের ফলস্বরূপ, কোনো নতুন শরিয়ত ছাড়াই একজন নবী আগমন করতে পারেন।

হুযুর আরও বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন-

'এক রাতে আমি এত অধিক পরিমাণে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করলাম যে, আমার হৃদয় ও আত্মা তা দ্বারা সুরভিত হয়ে উঠল। সেই রাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম, ফেরেশতারা নির্মল পানির আকৃতিতে নূরের মশক নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করছে। তাদের একজন বললেন, "এগুলো সেই বরকত, যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে।"'

আরেকবার তাঁর প্রতি ইলহাম হয়েছিল যে, 'মালায়ে আ'লা বিতর্কে লিপ্ত এবং আল্লাহর ইচ্ছা দ্বীনকে পুনর্জীবিত করার জন্য উচ্ছ্বসিত।' এরপর তিনি স্বপ্নে দেখলেন, মানুষ একজন পুনর্জীবনদাতাকে খুঁজছে। তখন একজন ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে ইশারায় বললেন, 'এই সেই ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ভালোবাসেন।'

হুযুর বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তা তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণেই লাভ করেছিলেন।

সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল, ওহির ধারা কি এখনও অব্যাহত আছে?

হুযুর আনওয়ার উত্তরে বলেন-

"আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলার সমস্ত গুণ আজও বিদ্যমান। তাঁর কোনো গুণ বিলুপ্ত হতে পারে না। তিনি অতীতেও মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, আজও কথা বলেন। মানুষ সত্য স্বপ্ন দেখে, আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন এবং রোগমুক্তি দান করেন।

আল্লাহ তা'আলা আজও কথা বলেন। তাঁর ওহি ও ইলহামের ধারা আজও অব্যাহত আছে এবং কেউ তা বন্ধ করতে পারে না।"

আরেক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন-

"বর্তমান বিশ্বের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর প্রধান কারণ হলো, মানুষ তাদের স্রষ্টাকে ভুলে গেছে। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, তাঁকে চেনা এবং যারা তাঁকে ভুলে গেছে, তাদের তওবা ও ইস্তিগফার করা। মানুষ যেন মানুষকে ভালোবাসে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।"

অক্টোবর, শনিবার, ২০১৩

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে এবং যে নির্যাতন (Persecution) চলছে, সেই পরিস্থিতিতে আহমদিয়া জামাআতের ভবিষ্যৎ কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) বলেন, এসব অত্যাচার ও কষ্টের পরও জামাআত অটল রয়েছে এবং সব ধরনের নির্যাতন ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করছে। যদি আইন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সহায়তা করে, তাহলে ভালো; অন্যথায় আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করি। আর যারা এই নির্যাতন সহ্য করতে পারেন না, তারা পাকিস্তান থেকে হিজরত করে অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশে বসবাস শুরু করেছেন। এটি পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য যে, দেশের মেধাবী ও দক্ষ জনশক্তি-যেমন ডাক্তার, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী প্রমুখ-দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এর ক্ষতি পাকিস্তানকেই বহন করতে হচ্ছে। আমরা আহমদিরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেছি। পাকিস্তান গঠনে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কায়েদে আযম পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে একজন আহমদি, চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রা.)-কে নিয়োগ দিয়েছিলেন। অথচ আজ শিশুদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রম থেকে তাঁর নাম পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে?

হুযুর আনওয়ার বলেন, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আহমদিরা সেখানে আছেন, সেখানেই থাকবেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত থাকবেন। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ যেন এই অত্যাচারীদের হেদায়েত দান করেন, তাদের বোধশক্তি দান করেন এবং তারা যেন এই অত্যাচার থেকে বিরত হয়।

সাড়ে এগারোটায় সাক্ষাৎকারটি সমাপ্ত হয়।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সাক্ষাৎ

এরপর কর্মসূচি অনুযায়ী পারিবারিক সাক্ষাতের অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেদিন সকালের এই পর্বে ৪৭টি পরিবারের মোট ১৯০ জন সদস্য তাঁদের প্রিয় ইমামের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। সাক্ষাৎকারী পরিবারগুলো সিডনির দুটি জামাআত-ব্ল্যাকটাউন এবং মার্সডেন পার্ক-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রতিটি পরিবার এই উপলক্ষে হুযুর আনওয়ারের সঙ্গে পৃথকভাবে ছবি তোলার সৌভাগ্য লাভ করে। স্নেহবশত হুযুর আনওয়ার শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের কলম উপহার দেন এবং ছোট শিশুদের চকোলেট প্রদান করেন।

এই সাক্ষাৎকারের কর্মসূচি দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর হুযুর আনওয়ার মসজিদ বায়তুল হুদা-য় গিয়ে যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করান। নামাজ শেষে তিনি তাঁর আবাসস্থলে ফিরে যান।

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা লাজনা ইমাঈল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে হুযুর আনওয়ারের বৈঠক

কর্মসূচি অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে হুযুর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) মসজিদ বায়তুল হুদা-য় আগমন করেন। সেখানে ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা লাজনা ইমাঈল্লাহ অস্ট্রেলিয়া-র সঙ্গে তাঁর বৈঠক শুরু হয়।

হুযুর আনওয়ার জেনারেল সেক্রেটারির কাছে জানতে চান, বিভিন্ন মজলিস থেকে মাসিক কার্যক্রমের রিপোর্ট কীভাবে সংগ্রহ করা হয়, সেগুলোর ভিত্তিতে কীভাবে মাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট মজলিসগুলোকে মন্তব্যসহ সেই রিপোর্টের উত্তর পাঠানো হয় কি না।

জেনারেল সেক্রেটারি জানান, প্রাপ্ত রিপোর্টগুলোর ওপর মন্তব্য করা হয়।

এ প্রসঙ্গে হুযুর আনওয়ার বলেন, লাজনার সভাপতির দায়িত্ব হলো সব রিপোর্ট নিজে পড়া, সেগুলোর ওপর মন্তব্য করা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মজলিসগুলোর কাছে তা পাঠিয়ে দেওয়া।

এরপর হুযুর আনওয়ার সেক্রেটারি তারবিয়তের কাছে লাজনার সিলেবাস সম্পর্কে জানতে চান।

তিনি বলেন, আপনাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, কতজন সদস্যা নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে জুমার খুতবা শোনেন, তা নির্ধারণ করা। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশে জালসা বা ইজতেমার সময় আমি লাজনার উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিই, সেটিও যেন প্রত্যেক সদস্যা শোনেন। এ বিষয়েও আপনাদের মূল্যায়ন করা উচিত।

খলিফাতুল মসীহের খুতবা ও ভাষণ শোনা এবং সেগুলোর আলোকে জীবন গঠন করা আপনাদের তারবিয়তের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের নিজেদের তারবিয়ত ভালো হলে সন্তানদেরও উত্তম তারবিয়ত সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন লাজনার প্রত্যেক সদস্যা নিয়মিত নামাজ আদায় করেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হবে।

এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, পরিবারের মায়েরা তাঁদের স্বামী ও সন্তানদের সময়মতো নামাজ আদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। বরং সন্তানদের মধ্যে নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদের মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করানো তাঁদের দায়িত্ব

হুযুর আনওয়ার আরও বলেন, আমার জুমার খুতবা এবং লাজনার উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংকলন করে লাজনার প্রত্যেক সদস্যার কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। ই-মেইলের মাধ্যমে তা

শেষাংশ ১২ পাতায়......

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

যখন হযরত হালিমা (রা.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় চার বছর। এরপর তিনি তাঁর মাতা হযরত আমিনার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।

যখন তাঁর বয়স ছয় বছর হলো, তখন তাঁর নানা-সম্পর্কীয় আত্মীয় বনু নাজ্জারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে হযরত আমিনা ইয়াসরিব (মদিনা) গমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও সঙ্গে নিয়ে যান। উম্মে আইমানও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সম্ভবত এই সফরে হযরত আমিনার মনে তাঁর প্রয়াত স্বামীর কবর জিয়ারত করার ইচ্ছাও ছিল। যাই হোক, তাঁরা ইয়াসরিবে গিয়ে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই সময়ের স্মৃতি মনে রেখেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে, যখন তিনি হিজরত করে মদিনায় আসেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সেই ঘরটি দেখিয়েছিলেন যেখানে তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে অবস্থান করেছিলেন। তিনি সেই স্থানও দেখিয়েছিলেন যেখানে তিনি মদিনার শিশুদের সঙ্গে খেলতেন এবং সেই পুকুরটিও দেখিয়েছিলেন যেখানে তিনি সাঁতার শেখার অনুশীলন করেছিলেন।

মাতৃ-বিয়োগ

প্রায় এক মাস অবস্থানের পর হযরত আমিনা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু তাঁর স্বামীর মতোই প্রবাসেই তাঁর মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আবওয়া নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

নবুওয়তের যুগে একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ওই স্থান দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন তিনি তাঁর মায়ের কবরেও যান। কবর দেখে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সাহাবায়ে কেরাম এ দৃশ্য দেখে তাঁরাও কাঁদতে শুরু করেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বললেন,

"আল্লাহ আমাকে আমার মায়ের কবর জিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর জন্য দোয়া করার অনুমতি দেননি।"

এর দ্বারা এ কথা বোঝা উচিত নয় যে, তাঁর মায়ের ক্ষমা হবে না। কারণ এ বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে, এবং এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না যে কী হবে বা কী হবে না। বরং এর দ্বারা শুধু এতটুকুই বোঝা যায়-যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্রও বলেছেন-যে ব্যক্তি শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার জন্য দোয়া করা সমীচীন নয়; বরং তার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দেওয়া উচিত।

মাতার ইন্তেকালের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ অর্থেই ইয়াতীম হয়ে গেলেন। অল্প বয়সে, জন্মভূমি থেকে দূরে, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মায়ের বিচ্ছেদ-যখন পিতা ইতোমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন-এটি কোনো সাধারণ শোক ছিল না। এসব ঘটনা তাঁর হৃদয়ে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু বাহ্যিক কারণের দৃষ্টিতে এসব ঘটনাও তাঁর স্বভাব ও চরিত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এক অর্থে বলা যায়, তাঁর চরিত্রে দরিদ্রদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা এবং বিপদগ্রস্তদের প্রতি অসাধারণ সহানুভূতির যে অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা এই শৈশবের দুঃখ-কষ্টেরই একটি ফল ছিল।

পবিত্র কুরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইয়াতীম অবস্থার উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি এবং আশ্রয় দেননি? অতএব, আপনারও কর্তব্য হলো ইয়াতীমদের প্রতি স্নেহ ও কোমল ব্যবহার করা।"

আবদুল মুত্তালিবের অভিভাকত্ব

মায়ের ইন্তেকালের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সেবিকা উম্মে আইমানের সঙ্গে মক্কায় ফিরে আসেন। এই উম্মে আইমানই ছিলেন সেই দাসী, যিনি তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর কাছে এসেছিলেন। পরিণত বয়সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মুক্ত করে দেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয় আচরণ করতেন। পরে উম্মে আইমানের বিবাহ মহানবীর মুক্তকৃত দাস হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)-এর সঙ্গে হয় এবং তাঁদের ঘরে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। উম্মে আইমান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরও জীবিত ছিলেন।

যাই হোক, মায়ের ইন্তেকালের পর তিনি উম্মে আইমানের সঙ্গে মক্কায় পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি যখন কাবাঘর তাওয়াফ করতেন, তখন তাঁকে নিজের কাঁধে বসিয়ে নিতেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক হয়ে উঠেছিলেন। আবদুল মুত্তালিবের অভ্যাস ছিল কাবার চত্বরে একটি বিছানা পেতে বসা, এবং কারও সাহস ছিল না যে তাঁর সঙ্গে সেই বিছানায় বসবে। এমনকি তাঁর নিজের ছেলেরাও দূরে বসতেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভীর স্নেহের টানে সরাসরি তাঁর পাশে গিয়ে বসতেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে দেখে আনন্দিত হতেন। কখনও কখনও তাঁর চাচারা তাঁকে সেই বিছানায় বসতে বাধা দিতেন, কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তাঁদের থামিয়ে দিয়ে বলতেন, "তাকে কিছু বলো না।"

এখন যদি বলা হয় যে পবিত্র কুরআনে নাসারার হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রশংসা করা হয়েছে, তবে এটিও উপরে উত্থাপিত আপত্তির সমর্থনে কোনো প্রমাণ হতে পারে না। কারণ, প্রথমত, হযরত ঈসা (আ.)-এর যে প্রশংসা করা হয়েছে, তা একজন নবী হিসেবে করা হয়েছে; আল্লাহর পুত্র বা আল্লাহ হিসেবে নয়, যা খ্রিষ্টধর্মের দাবি। দ্বিতীয়ত, এই প্রশংসা কেবল হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য বিশেষ নয়। কেননা পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী সকল নবীরই প্রশংসা করেছে এবং তাঁদেরকে অত্যন্ত মহান ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করেছে। বরং পবিত্র কুরআন অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই নীতি উপস্থাপন করেছে যে, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই আল্লাহর রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। এভাবে কুরআন মুসলমানদের অন্তরে বিশ্বের সকল জাতির মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এটি একটি সুস্পষ্ট সত্য যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাস্য হওয়ার ধারণা এবং খ্রিষ্টধর্মের অন্যান্য মৌলিক আকীদাকে ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে একজন মানব রাসূলের বেশি কোনো মর্যাদা দেয়নি, যিনি তাঁর পার্থিব জীবন সম্পন্ন করে অন্যান্য রাসূলদের মতোই ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং ইসলাম খ্রিষ্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে-এই আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য।

আর যদি বলা হয় যে, খ্রিষ্টধর্মের কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ইসলামের মধ্যেও বিদ্যমান, তাই ধারণা করা যেতে পারে যে ইসলাম এসব শিক্ষা খ্রিষ্টধর্ম থেকে গ্রহণ করেছে, তবে এটিও একটি সম্পূর্ণ অমূলক আপত্তি। কারণ, প্রথমত, যখন ইসলাম এবং বর্তমান খ্রিষ্টধর্মের বহু মৌলিক শিক্ষা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তখন কোনো গৌণ বিষয়ে উভয় শিক্ষার মধ্যে কিছু মিল থাকলেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, একটি শিক্ষা অন্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যখন ইসলাম হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর একজন মনোনীত রসুল বলে বিশ্বাস করে এবং নিজেও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্ম হওয়ার দাবি করে, তখন একই উৎস থেকে আগত হওয়ার কারণে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের কিছু শিক্ষা পরস্পরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। কেননা হিদায়াতের মৌলিক নীতিমালা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির জন্য একই।

তৃতীয়ত, পবিত্র কুরআন নিজেই এই দাবি করে যে, পূর্ববর্তী সমস্ত ঐশী শিক্ষার স্থায়ী ও চিরন্তন সত্যসমূহকে সে নিজের মধ্যে সমন্বিত করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

অর্থাৎ, কুরআনের মধ্যে পূর্ববর্তী সমস্ত ঐশী গ্রন্থের স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যসমূহ একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, এই দিক থেকেও খ্রিষ্টধর্মের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা একচেটিয়া দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পবিত্র কুরআন তার এই বৈশিষ্ট্যকে-যে এতে পূর্ববর্তী ঐশী শিক্ষাসমূহের সকল স্থায়ী সত্য এবং সুদৃঢ় ও চিরন্তন বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-একটি পরিপূর্ণতার নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন যেন নিজেকে একটি মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করেছে। মৌমাছি যেমন নানা প্রকার ফল ও ফুল থেকে তাদের নির্যাস সংগ্রহ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম বস্তু, অর্থাৎ মধু প্রস্তুত করে, যা যদিও বিভিন্ন ফল ও ফুলের নির্যাসের সমষ্টি, তবুও তা সম্পূর্ণ নতুন একটি বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে কোনো নির্দিষ্ট ফল বা ফুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় না।

এছাড়াও, পবিত্র কুরআন কেবল পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহ থেকে তাদের স্থায়ী শিক্ষাগুলিই গ্রহণ করেনি; বরং যেহেতু এটি একটি চিরস্থায়ী শরিয়তের অধিকারী, তাই কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বহু নতুন বিষয়ও সংযোজন করেছে এবং এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন শরিয়ত উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি নিহিত রেখেছেন যে, এই দৃশ্যমান বিশ্বজগতের ন্যায় এটি কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণের সমস্ত উপকরণ নিজের মধ্যে গোপন করে রেখেছে, যা প্রয়োজন অনুসারে ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{৭৯} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে কপূরথালার আহমদিয়া জামাআত ও অনাহমদিদের মধ্যে সেখানকার একটি মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি মামলা হয়। যে বিচারকের নিকট মামলাটি উপস্থাপিত হয়, তিনি নিজেও অ-আহমদি ছিলেন এবং জামাআতের বিরোধী ছিলেন। তিনি মামলায় পক্ষপাতমূলক আচরণ করতে শুরু করেন।

এ অবস্থায় কপূরথালার জামাআত উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট চিঠি লিখে দোয়ার আবেদন করে। হযরত (আ.) তাদের উত্তরে লিখলেন, "যদি আমি সত্যবাদী হই, তবে মসজিদ তোমরাই পাবে।"

কিন্তু বিচারক আগের মতোই বিরোধিতাপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আহমদিদের বিরুদ্ধে রায় লিখে ফেললেন। যেদিন তাঁর সেই রায় ঘোষণা করার কথা ছিল, সেদিন সকালে তিনি পোশাক পরে নিজের বাংলোর বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এবং একজন ভৃত্যকে বললেন তাঁর জুতা পরিয়ে দিতে। তিনি একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। চাকর জুতা পরিয়ে ফিতা বাঁধতে শুরু করল। হঠাৎ সে একটি শব্দ শুনতে পেল। উপরে তাকিয়ে দেখল, তার মনিব কোনো অবলম্বন ছাড়াই চেয়ারের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। সে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারল যে তিনি মারা গেছেন। মনে হলো, হঠাৎ হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে একজন হিন্দুকে অস্থায়ী বিচারক নিযুক্ত করা হয়। তিনি পূর্ববর্তী বিচারকের লিখিত রায় বাতিল করে আহমদিদের পক্ষে রায় প্রদান করেন।

বিনীত নিবেদনকারী বলেন, মাওলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব, মাওলভী ফাযিল, আমাকে বলেছেন:

"একবার আমি কপূরথালায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, স্থানীয় জামাআত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্যটি-'যদি আমি সত্যবাদী হই, তবে মসজিদ তোমরাই পাবে'-অত্যন্ত সুন্দর বড় অক্ষরে লিখিয়ে সেই মসজিদের ভেতরেই স্থাপন করেছে।"

বিনীত নিবেদনকারী আরও বলেন, কপূরথালার জামাআত অত্যন্ত প্রাচীন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দীর্ঘদিনের নিষ্ঠাবানদের অন্যতম। আমি শুনেছি, তাদের কাছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি লিখিত পত্র রয়েছে, যাতে তিনি লিখেছেন:

"আমি আশা করি, কপূরথালার জামাআত যেভাবে এই পৃথিবীতে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে জান্নাতেও আমার সঙ্গে থাকবে।"

{৮০} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। মাওলভী রহীম বখ্‌শ সাহেব এম.এ. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন: "আমার দাদা, যাঁকে সাধারণত 'খলীফা' বলে ডাকা হতো, তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত কটু ভাষায় কথা বলতেন এবং আমার পিতাকে খুব কষ্ট দিতেন।

অবশেষে আমার পিতা অতিষ্ঠ হয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট দোয়ার জন্য একটি চিঠি লিখলেন। হযরত (আ.)-এর পক্ষ থেকে উত্তর এলো: 'আমরা দোয়া করেছি।'

আমার পিতা সেই চিঠি পুরো মহল্লার লোকদের দেখিয়ে বললেন, 'হযরত সাহেব দোয়া করেছেন। এখন দেখবেন, খলীফা আর গালাগালি করবে না।'

দুই-তিন দিন পরে শুক্রবার ছিল। আমাদের দাদা আগের নিয়ম অনুযায়ী অআহমদিদের সঙ্গে জুমার নামাজ পড়তে গেলেন। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি অস্বাভাবিকভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। অথচ তাঁর অভ্যাস ছিল, প্রতি শুক্রবার নামাজ শেষে বাড়ি ফিরে বিশেষভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে গালাগালি করা।

লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আজ আপনি মির্জা সাহেব সম্পর্কে নীরব কেন?' তিনি বললেন, 'কারও সম্পর্কে কটু ভাষায় কথা বলে কী লাভ? আজ মাওলভীও জুমার খুতবায় বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যতই খারাপ হোক না কেন, আমাদের তার বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়।'

লোকেরা বলল, 'তাই নাকি? আপনি তো সব সময় গালাগালি করতেন, আর আজ হঠাৎ আপনার এই পরিবর্তন! আসল কথা হলো, বাবু'-আমার পিতাকে সবাই বাবু বলে ডাকত-'গতকালই কাদিয়ান থেকে আসা একটি চিঠি দেখাচ্ছিল এবং বলছিল, এখন থেকে খলীফা আর গালাগালি করবে না।'

মাওলভী রহীম বখ্‌শ সাহেব বলেন: "এরপর বহুবার বিরোধীরা আমার দাদাকে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করলেও তিনি আর কখনও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কটু ভাষা ব্যবহার করেননি এবং আহমদি হওয়ার কারণে আমার পিতাকেও আর কখনও কষ্ট দেননি।"

(এই বর্ণনার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালে এই বর্ণনাকারী হযরত খলীফাতুল মসীহের ইচ্ছানুযায়ী নিজের নাম পরিবর্তন করে 'আবদুর রহীম' রাখেন এবং পরবর্তীকালে তিনি সাধারণভাবে মাওলভী আবদুর রহীম সাহেব দরদ নামে পরিচিত হন।)

{৮১} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।আমাকে হযরত ওয়ালিদা সাহেবা বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খিঁচুনির আক্রমণ শুরু হয়, তখন প্রথম বছর তিনি পুরো রমযানের রোযা রাখতে পারেননি এবং ফিদিয়া আদায় করেছিলেন। পরের রমযান এলে তিনি আবার রোযা রাখা শুরু করেন। কিন্তু আট-নয়টি রোযা রাখার পর আবার রোগের আক্রমণ হয়। ফলে তিনি বাকি রোযাগুলো রাখতে পারেননি এবং ফিদিয়া আদায় করেন।

এরপরের রমযানে তিনি দশ-এগারোটি রোযা রেখেছিলেন। তারপর আবার রোগের আক্রমণের কারণে তাঁকে রোযা ছেড়ে দিতে হয় এবং তিনি ফিদিয়া আদায় করেন।

এর পরের রমযানে তাঁর তেরোতম রোযা চলছিল। মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে আবার দৌরা হয়। তিনি রোযা ভেঙে দেন এবং বাকি রোযাগুলো আর রাখেননি। সেগুলোর পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করেন।

এরপর যত রমযান এসেছে, তিনি সব রোযাই রেখেছেন। তবে ইন্তেকালের দুই-তিন বছর আগে দুর্বলতার কারণে আর রোযা রাখতে পারেননি এবং ফিদিয়া আদায় করতে থাকেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, প্রথম দিকে যখন তিনি দৌরার সময় রোযা ছেড়েছিলেন, তখন পরে কি সেগুলোর কাযা আদায় করেছিলেন?

ওয়ালিদা সাহেবা বললেন, "না, তিনি শুধু ফিদিয়া আদায় করেছিলেন।"

আমি নিবেদন করছি, যখন প্রথম দিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাথা ঘোরা এবং হাত-পায়ে অবশভাবের দৌরা শুরু হয়, তখন তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যও খারাপ থাকত। তাই যখন তিনি রোযা ছেড়ে দিতেন, তখন মনে হয় পরবর্তী রমযান পর্যন্তও সেগুলোর কাযা করার মতো শক্তি তিনি ফিরে পেতেন না। কিন্তু পরের রমযান এলেই ইবাদতের আগ্রহে তিনি আবার রোযা রাখা শুরু করতেন। পরে আবার দৌরা (রোগের আক্রমণ) হলে রোযা ছেড়ে দিতেন এবং বাকি রোযাগুলোর ফিদিয়া আদায় করতেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

{৮২} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম দিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঘেরওয়ালা ঢিলেঢালা পায়জামা (ঘরারা) ব্যবহার করতেন। পরে আমি তাঁকে বলায় তিনি তা পরা বন্ধ করেন। এরপর তিনি সাধারণ ধরনের পায়জামা ব্যবহার করতে শুরু করেন।

আমি নিবেদন করছি, 'ঘরারা' বলতে খুব প্রশস্ত পায়চাওয়ালা পায়জামাকে বোঝায়। আগে ভারতে এর প্রচলন ছিল খুব বেশি, এখন অনেক কমে গেছে।

মোহর নারীর অধিকার

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম) বলেন:

"এটি নারীর অধিকার; তাকে তা প্রদান করা উচিত। সর্বোত্তম হলো, নিকাহের সময়ই মোহর পরিশোধ করে দেওয়া। অন্যথায় পরে তা আদায় করা উচিত। পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানে একটি প্রথা রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় বা তার কিছু আগে স্ত্রী তার মোহর স্বামীকে মাফ করে দেন। কিন্তু এটি কেবল একটি সামাজিক রীতি।" (মালফুযাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬০৬)

এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মোহর মাফ করে দিতে বলেছিলেন, কিন্তু এর মধ্যেই সেই স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন স্বামীর কী করা উচিত?

হযরত আকদাস (আলাইহিস সালাম) বলেন:

"তার উচিত স্ত্রীর মোহরের অর্থ তার উত্তরাধিকারীদের দিয়ে দেওয়া। যদি তার সন্তান থাকে, তবে তারাও উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়ত অনুযায়ী তারা নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করবে। একইভাবে স্বামীও তার নির্ধারিত শরয়ী অংশ গ্রহণ করতে পারে।" [মালফুযাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩৫]

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

"হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, মোহর শরিয়তের একটি বিধান। তা নারীদের প্রদান করা উচিত। সঠিক পদ্ধতি হলো, প্রথমে নারীর কাছে মোহর পরিশোধ করে দেওয়া হবে। এরপর যদি তিনি ইচ্ছাক্রমে তা মাফ করে দিতে চান, তাহলে দিতে পারেন।"

[আল-আযহার লিযাওয়াতিল খিমার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫২]

(রিশতা নাতা-বিভাগ, নযারত ইস্লাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028

Vol-11 Thursday, 13 Aug 2026 Issue No.33

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

৯পাতার পর....

পাঠানো যেতে পারে এবং মাসিক সভায়ও তা বিতরণ করা যেতে পারে। এরপর হুযূর আনওয়ার তেহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং লাজনাকে নির্দেশ দেন যে, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তাঁরা শুধু সদস্যা ও শিশুদের এসব গুরুত্বপূর্ণ চাঁদার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন, স্মরণ করিয়ে দেন এবং অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

এর উত্তরে হুযূর আনওয়ার বলেন, লাজনার উচিত পুরো বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং প্রত্যেক সদস্যার কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে সেই লক্ষ্য পূরণ করা। এর মাধ্যমে আপনারা জাতীয় পর্যায়ের তেহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের সেক্রেটারিদের সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবেন। যখন সহকারী সংগঠনগুলো নিজ নিজ লক্ষ্য পূরণ করে, তখন সামগ্রিকভাবে জামাআতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয় এবং অনেক দেশ ও জামাআত বিশেষ সাফল্য অর্জনকারী হিসেবে পরিচিত হয়।

হুযূর আনওয়ার আরও বলেন, লাজনার সদস্যাদের জানা উচিত, তারা কী দিচ্ছেন এবং কেন দিচ্ছেন। এই উপলব্ধি থাকা অত্যন্ত জরুরি। একইভাবে যখন আপনারা শিশু ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ করবেন, তখন তাদেরও বোঝাতে হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই চাঁদা প্রদান করছে।

সেক্রেটারি মাল

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) সেক্রেটারি মালের কাছে লাজনার সামগ্রিক বাজেট সম্পর্কে জানতে চান এবং নির্দেশনা প্রদান করেন যে, লাজনার যেসব সদস্যা চাঁদা প্রদানে বকেয়াদার রয়েছেন, তাঁদের পেছনে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। হতে পারে তাঁদের কোনো যৌক্তিক কারণ রয়েছে, যার ফলে তাঁরা চাঁদা পরিশোধ করতে পারছেন না। তবে যদি জামাআতের কোনো লাজনার অন্য কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে অবশ্যই সেই সমস্যার সমাধান করা উচিত।

অডিটর

হুযূর আনওয়ার অডিটরের কাছে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে চান এবং হিসাব-নিকাশ কতটা পরিমাণে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তা পর্যালোচনা করেন।

সেক্রেটারি খিদমতে খালক

হুযূর আনওয়ার সেক্রেটারি খিদমতে খালকের কাছে সারা বছরের কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চান এবং নির্দেশ দেন যে, কর্মসূচির মধ্যে Old Homes (বৃদ্ধাশ্রম), স্কুল ও হাসপাতাল পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। একইভাবে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের (ঈযধৎরঃরবং) জন্য তহবিল সংগ্রহের কর্মসূচিও আয়োজন করা উচিত।

হুযূর আনওয়ার আরও নির্দেশনা দেন যে, যখন আপনারা এ ধরনের সেবা করবেন এবং বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করবেন, তখন অ-আহমদি মানুষের কাছে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আহমদিয়া জামাআতের মহিলা সংগঠনই এই তহবিল প্রদান করছে অথবা এই সেবা ও সহায়তা করছে।

সেক্রেটারি সানআত ও দস্তকারি

হুযূর আনওয়ার সেক্রেটারি সানআত ও দস্তকারির কাছে বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান।

তিনি বলেন, যেসব বয়স্ক মহিলা বাড়িতে থাকেন, তাঁদেরও এই বিভাগের কাজে সম্পৃক্ত করুন। তাঁরা ঘরে বসে বিভিন্ন জিনিস প্রস্তুত করতে পারেন। এরপর নিয়মিত বার্ষিক প্রদর্শনী, মীনা বাজার আয়োজন করুন এবং ইজতেমার সময়ও স্টল স্থাপন করুন।

সেক্রেটারি নাসিরাত

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) সেক্রেটারি নাসিরাতের কাছে পর্দার মান সম্পর্কে জানতে চান এবং নির্দেশ দেন যে, পর্দার ক্ষেত্রে সেক্রেটারি নাসিরাতের উচিত কিশোরীদের জন্য একটি উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় নমুনা হওয়া। কারণ মেয়েরা তাঁদের সেক্রেটারিকে অনুসরণ করবে। যদি সেক্রেটারির পর্দার মান উত্তম হয়, তবে কিশোরীদের পর্দার মানও ভালো হবে।

হুযূর আনওয়ার নাসিরাতের পাঠ্যসূচি সম্পর্কেও জানতে চান। এছাড়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বার্ষিক কুইজের জন্য কোন বই নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রথমত বার্ষিক কুইজের একটি নিয়মিত কর্মসূচি থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, এ উদ্দেশ্যে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোনো একটি গ্রন্থ থেকে প্রতি বার দুই পৃষ্ঠা নির্বাচন করা যেতে পারে। পুরো বই নির্ধারণ করা উচিত নয়, কারণ তা নাসিরাতদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) আরও নির্দেশ দেন যে, নাসিরাতদের দিয়ে প্রবন্ধ লেখানো উচিত এবং এর জন্য নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করা উচিত। যেমন একটি বিষয় হতে পারে- "আমরা কেন আহমদি?"

হুযূর আনওয়ার বলেন, কিশোরীদের নিজেদের ধর্মীয় ও নৈতিক মান উন্নত করা উচিত এবং তাদের জানা উচিত যে, আমরা কেন আহমদি।

তিনি আরও বলেন, ইজতেমার সময় বক্তৃতার বিষয়গুলো হতে পারে- আল্লাহ তা'আলা, আমাদের প্রতিপালক; আহমদিয়া খিলাফত; খিলাফতের বরকত; খিদমতে খালক; অন্যদের সেবা করা এবং মানুষের উপকারে আসা ইত্যাদি। (চলবে)

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ - ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩)

তোমাদের অবস্থা তোমাদের ইমামের হাতে এমন হওয়া উচিত, যেমন গোসলদাতার হাতে মৃতদেহ থাকে।
হযরত খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রা.)-এর বাণী

শেষে আমি আরও একটি কথা বলতে চাই এবং এই নসিহত করছি যে, তোমাদের সম্পর্ক যেন আল্লাহর রজ্জুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। পবিত্র কুরআন যেন তোমাদের জীবন পরিচালনার বিধান হয়। তোমাদের মধ্যে যেন কোনো বিরোধ না থাকে। কারণ, পারস্পরিক বিরোধ আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকতকে বাধাগ্রস্ত করে।

হযরত মূসা (আ.)-এর কওম মরুভূমিতে নিজেদের ত্রুটির কারণেই ধ্বংস হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মত সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, তাই তারা সফল হয়েছিল। এখন তৃতীয়বার তোমাদের পালা এসেছে। অতএব, তোমাদের অবস্থা তোমাদের ইমামের হাতে এমন হওয়া উচিত, যেমন গোসলদাতার হাতে মৃতদেহ থাকে।

তোমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যেন মৃত হয়ে যায় এবং তোমরা নিজেদেরকে ইমামের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত করো, যেমন রেলগাড়ির বগিগুলো ইঞ্জিনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।নএরপর প্রতিদিন নিজেরা পরীক্ষা করো যে, তোমরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছ কি না। অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করো এবং দোয়ায় মশগুল থাকো। ঐক্যকে কখনো হাতছাড়া করো না। অন্যদের প্রতি সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার করতে কোনো প্রকার ত্রুটি করো না।

তেরোশো বছর পর তোমরা এই যুগ লাভ করেছ, আর কিয়ামত পর্যন্ত এমন যুগ আর আসবে না। সুতরাং এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করো। কারণ, কৃতজ্ঞতার ফলে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়।

'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বৃদ্ধি করে দেব।' কিন্তু যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে স্মরণ রাখুক- 'নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।' (সূরা ইবরাহীম) (আল-হাকাম, ২৪ জানুয়ারি ১৯০৩, খণ্ড ৭, সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠা ১৫)

"তোমরা এই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। এটিও আল্লাহরই রজ্জু, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একত্রিত করেছেন। সুতরাং এটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখো।

তোমরা ভালোভাবে মনে রেখো, এখন খলীফাকে অপসারণ করা তোমাদের ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোমরা যদি আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পাও, তবে আমাকে জানাও। কিন্তু শিষ্টাচার কখনো পরিত্যাগ করো না। খলীফা বানানো মানুষের কাজ নয়; এটি আল্লাহ তাআলার নিজস্ব কাজ। আল্লাহ তাআলা চারজন খলীফা মনোনীত করেছেন- হযরত আদম (আ.), হযরত দাউদ (আ.), আর সেই খলীফা, যার প্রতিশ্রুতি 'লাইয়াস তাখলিফান্নাহুম ফিল আরজ'-এ দেওয়া হয়েছে। আর তোমাদের সকলকেও তিনি খলীফা করেছেন।

অতএব, যদি আমাকে খলীফা করা হয়ে থাকে, তবে আল্লাহই আমাকে খলীফা করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যে তা করেছেন। তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্যই আমাকে খলীফা করেছেন। আল্লাহ তাআলার মনোনীত খলীফাকে কোনো শক্তিই অপসারণ করতে পারে না। তাই তোমাদের মধ্যে কারও আমার খিলাফত বাতিল করার কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই। যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে অপসারণ করতে চান, তবে তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন।"(পত্রিকা 'বদর', ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩, খণ্ড ১১, সংখ্যা ১৮-১৯, পৃষ্ঠা ৩)

"এই আপত্তি করা যে, খিলাফত প্রকৃত হকদারের কাছে পৌঁছেনি-এটি রাফেযীদের বিশ্বাস। এ থেকে তওবা করো। আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে যাকে উপযুক্ত মনে করেছেন, তাকেই খলীফা করেছেন। যে এর বিরোধিতা করে, সে মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী। তোমরা ফেরেশতাদের মতো আনুগত্য ও বাধ্যতা অবলম্বন করো; ইবলীসের মতো হয়ো না।" ('বদর', ৪ জুলাই ১৯১২, খণ্ড ১২, সংখ্যা ১, পৃষ্ঠা ৭)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir